সাইমুম-১৮

ব্ল্যাক ক্রসের মুখোমুখি

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

উল্টে-পাল্টে কাগজটা আহমদ মুসা বার বার পড়ল। না পরিষ্কার লেখা। লেখায় বিন্দুমাত্র দ্ব্যর্থবোধকতা নেই। '১৩১-এর সি, রূয়ে আনাতলে ডেলা ফর্গ'- স্পষ্টাক্ষরে লেখা। কিন্তু এই নাম্বারে কোন বাড়ি নেই।

গতকাল দু'বার এসে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে। খোঁজায় কোন ফাঁক রাখেনি। কিন্তু বাড়িটা পাওয়া যায়নি। একশ' একত্রিশ-এর এ,বি,সি, কিছুই নেই।

কিন্তু মন তার মানছে না। পরাজয় স্বীকার করে নিতে রাজি হচ্ছে না তার মন।

গতকাল দু'বারই দিনের বেলা খুঁজেছে। আর রাতে খুঁজবে মনে করে রুয়ে আনাতলে রোডের সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নামল আহমদ মুসা ট্যাক্সি থেকে। রাত তখন ৯টা।

ঠিকানার সন্ধানে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরির পর আহমদ মুসা ঠিক করল লোকদের আজকে সে জিজ্ঞেস করবে। ১৩১নং বাড়িতে গিয়ে নক করল আহমদ মুসা। মুহূর্ত কয়েক পরে দরজা খোলার শব্দ হলো। দরজা অল্প ফাঁক করে একটা মুখ বলল, 'কি সহযোগিতা করতে পারি আপনাকে। কাকে চাই আপনার?'

'আমি একজন বিদেশী। '১৩১-এর সি' বাসাটা আমি খুঁজছি। দয়া করে সাহায্য করতে পারেন?' বিনীতভাবে বলল আহমদ মুসা।

দরজাটা এবার খুলে গেল।

একজন তরুণী খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, 'নাম্বারটা আপনি কোথায় পেলেন?'

'নাম্বারটির মালিক যিনি তারই লেখা ঠিকানা থেকে তুলে নিয়েছি'।

'যাই হোক, আপনার ভুল হয়েছে। এ ধরণের কোন নাম্বার এ রাস্তায় নেই। এ রাস্তায় কোন নাম্বারের সাথেই এ,বি,সি ইত্যাদি ধরণের কোন কিছুর সংযোজন নেই।'

আহমদ মুসা ভাবছিল। মেয়েটির কথার জবাবে কিছু বলল না।

'আপনার অসুবিধার জন্যে দুঃখিত। ওকে'। বলে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল মেয়েটি। আহমদ মুসা বলল, 'দয়া করে কি বলবেন, আপনার আব্বার নাম কি?'

মেয়েটির মুখ মুহুর্তের জন্যে মলিন দেখা গেল। তারপরই হেসে উঠে বলল, 'বুঝতে পেরেছি আপনি জানতে চাচ্ছেন এ বাড়িটাই আপনার বাঞ্ছিত বাড়ি কিনা। না তা নয়। আমি ও আমার আম্মা ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ থাকেন না'।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা সরে এল তাদের বাড়ির গেট থেকে। পিতার নাম জিজ্ঞেস করায় মেয়েটির মুখ মলিন হওয়া থেকে আহমদ মুসা বুঝল, তার আব্বা নেই। ওরা 'সিংগল' প্যারেন্ট ফ্যামেলি। এমন বিয়ে বহির্ভূত মা ও সন্তানের সিংগল ফ্যামিলি এখন পাশ্চাত্যে হাজার হাজার। কিন্তু বিরাট এক দুর্ভিক্ষ তাদের মনে। মেয়েটির ম্লান মুখে দেখা গেছে তারই একটা প্রতিচ্ছবি।

রাস্তায় নেমে এল আহমদ মুসা। কিন্তু কোথায় যাবে সে!

আহমদ মুসা শিথিল পায়ে আনমনে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। ডুপ্লের ঠিকানা নিয়েই সে ভাবছে। তার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে, মি. ফ্রাংক তাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে কিংবা ডুপ্লে ভুল ঠিকানা লিখেছে। কিন্তু সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে ১৩১-এর সাথে কোন এ,বি,সি নেই এবং মেয়েটিও তাই বলল। তাহলে?

ঠিকানা লেখা কাগজটির ওপর আবার নজর বুলাল আহমদ মুসা। দেখল, ১৩১-এর 'সি' লিখে তার পাশে আবার '+' চিহ্ন দেয়া আছে। চমকে উঠল আহমদ মুসা। এখানে '+' চিহ্ন কেন? এর অর্থ কি এই যে, ১৩১ থেকে 'প্লাস' অর্থাৎ সামনের দিকে 'সি' অর্থাৎ তিন নাম্বার বাড়িটাই ডুপ্লের হবে? সংকেতে কি এটাই বুঝাতে চেয়েছে?

আহমদ মুসা মুখ তুলে দেখল। সে যে বাড়ির সামনে এসে দাড়িয়েছে, সেই বাড়িটিই ১৩১-এর পর তিন নাম্বার বাড়ি। তাহলে এখানেই কি ডুপ্লে থাকেন?

কিন্তু আবার ভাবল, ডুপ্লে ঠিকানা এভাবে লিখবে কেন? না, এখানে ঠিকানা লেখার এরকম একটা প্রচলন আছে, যা অনেকেই ইচ্ছা হলে লিখে থাকে।

হঠাৎ একাধিক নারী কন্ঠের চাপা চিৎকারে আহমদ মুসা চমকে উঠল। আহমদ মুসা যাকে ডুপ্লের বাড়ি বলে ভাবছে, সেখান থেকেই এই চিৎকার আসছে। ধ্বস্তাধ্বস্তির একটা শব্দও কানে আসছে আহমদ মুসার।

রাস্তা থেকে ছুটল আহমদ মুসা বাড়িটার দিকে।

বাড়ির সামনে দু'টো গাড়ি দাড়িয়ে আছে। একটা সাধারণ মাইক্রোবাস, আরেকটা অত্যন্ত দামী গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দা পার হয়ে লাফ দিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল। সামনেই একটা দরজা। সম্ভবত বাড়ির ড্রইং রুম। ধ্বস্তাধ্বস্তি থেমে গেছে। ভয়ার্ত নারী কন্ঠ এবার চিৎকারের বদলে কেঁদে কেঁদে জীবন ভিক্ষার জন্যে অনুনয়-বিনয় করছে।

আহমদ মুসা দরজায় মৃদু চাপ দিল। দরজা নড়ে উঠল। খুশি হলো আহমদ মুসা, দরজা খোলা আছে দেখে। দরজা ঠেলে কৌতুহলী আগন্তুকের মত ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। যখন আহমদ মুসা ঘরের ভেতর পা রাখল, তখন একটি কন্ঠ চিৎকার করে বলছে, 'শোরগোল না থামালে তোমাদেরও বেঁধে নিয়ে যাব আমরা। তাতে আমাদের মজাই হবে। আহমদ মুসা দেখতে পেল, একজনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে একজন মহিলা কাঁদছে। পাশেই আরেকটি তরুণী গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। এদেরকে লক্ষ্য করেই ঐ কন্ঠটি চিৎকার করে উঠেছিল।

আর আহমদ মুসা, তার সামনেই দেখতে পেল হাত-পা বাঁধা একজন লোককে দু'জন লোক নিয়ে আসছে। একজন ধরেছে দুই পা, আরেকজন হাত।

আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখেই লোক দু'টি বাঁধা লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়া মহিলাকে শাসাচ্ছিল যে লোকটি সেও ফিরে দাঁড়াল।

মোট ওরা তিনজন।

'কে তুই? কি চাস এখানে?' সামনে দাড়ানো দু'জনের একজন চিৎকার করে বলল।

তার চিৎকারে মেঝেয় গড়াগড়ি দেয়া মেয়ে দু'টি এদিকে ফিরে তাকিয়েছে।

'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কান্নাকাটি দেখে এলাম'। অত্যন্ত শান্ত কন্ঠে গোবেচারা ভংগীতে বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে প্রাণের ভয় থাকলে যেদিক দিয়ে এসেছিস সেদিক দিয়ে কেটে পড়'। বলল ওদের একজন।

'কিন্তু বুঝতে পারছি না আমি, এখানে কি হচ্ছে?'

'আবার কথা' বলে একজন তেড়ে এল আহমদ মুসার দিকে। কাছাকাছি এসে বলল, 'তুই কি কানে শুনতে পাস না? আমরা কি বলেছি?'

'শুনতে পেয়েছি। কিন্তু লোকটির কি অপরাধ? তাকে এইভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'ছুঁচোটা দেখছি বড় পাজি, বলে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো লোকটি আহমদ মুসার নাক লক্ষ্যে প্রচন্ড এক ঘুষি চালাল।

আহমদ মুসা মাথা একটু নিচু করে তার ঘুষি চালানো হাতটাকে বাঁহাত দিয়ে কনুই বরাবর ধরে ফেলে ডান হাত দিয়ে তার কোমরের বেল্টটা ধরে তাকে একটানে শূন্যে উঠিয়ে নিল এবং ছুড়ে মারল তার সামনের দ্বিতীয় লোকটির ওপর। ওরা দু'জনেই আছড়ে পড়ল মাটিতে।

তৃতীয় জন যে মহিলাকে শাসাচ্ছিল সে হাতে রিভলবার তুলে নিয়েছে।

কিন্তু আহমদ মুসা লোকটিকে ছুঁড়ে ফেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ লোকটির ওপর। সে রিভলবার তাক করার আগেই আহমদ মুসা তার ওপর গিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা পড়ে গিয়েই তার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার।

ততক্ষণে ঐ দু'জন লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা ছুটে আসছে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা রিভলবার হাতে নিয়েই তা ঘুরিয়ে ধরল ঐ দু'জনের দিকে। পর পর দু'বার ফায়ার হলো। নিঃশব্দে দু'টো গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল ওদের দু'জনকে। বুক চেপে ধরে ওরা গিয়ে আছড়ে পড়ল হাত-পা বাঁধা মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটির ওপর।

সময় পেয়েছিল আহমদ মুসা যার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই লোকটি। সে চাকু বের করে নিয়েছিল। চাকু উঠাচ্ছিল সে আহমদ মুসার পাঁজর লক্ষ্য করে।

এই সময় একটা নারী কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'আহমদ মুসা, পেছনে চাকু'।

শব্দটি এল কক্ষের বাইরে বাড়ির ভেতরের দিক থেকে।

চিৎকারটি কান স্পর্শ করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা স্প্রিং-এর মত ছিটকে উঠল উপরের দিকে। চাকুর আঘাতটাকে সম্পূর্ণ এড়াতে পারল না আহমদ মুসা। মারাত্মক চাকুটা পাঁজরের বদলে আঘাত করল আহমদ মুসার ডান হাঁটুর নিচের মাসলটাকে।

কেঁপে উঠেছিল আহমদ মুসার দেহটা। অবচেতনভাবেই আহমদ মুসার দেহ সামনে একটু বেঁকে গিয়েছিল। কিন্তু রিভলবারটা হাতে স্থির ছিল।

চাকু মেরেই লোকটা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল আর একটা চাকু। ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসার রিভলবার স্থির করাই ছিল লোকটির দিকে। শুধু আঙুলের চাপ পড়ল ট্রিগারের ওপর। সরাসরি বুকে গুলী খেয়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরে উল্টে পড়ে গেল লোকটি।

ছুটে ঘরে এসে প্রবেশ করল একটি মেয়ে। বসল আহমদ মুসার পায়ের কাছে। পেশীর মধ্যে গেঁথে যাওয়া ছুরিটা টান মেরে বের করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেপে ধরল দু'হাতে আহমদ মুসার আহত জায়গাটা।

'ডোনা তুমি ঐ লোকটির বাঁধন আগে কেটে দাও তো ঐ ছুরি দিয়ে'। বলল আহমদ মুসা।

মেঝেয় গড়াগড়ি যাওয়া ক্রন্দনরত মহিলা ও তরুণীটি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল। এখনও কাঁপছে তারা। কন্ঠে তাদের কোন কথা নেই। যেন বোবা হয়ে গেছে তারা।

বাঁধা অবস্থায় মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটি এতক্ষণ আতংকিত চোখে নির্বাকভাবে সবকিছু দেখছিল। দু'জন লোক গুলী খেয়ে তার ওপর পড়ে গেলেও সে একটুও সরার চেষ্টা করেনি। যেন ওদের সাথে সেও মরে গেছে।

এবার সে লাশের নিচ থেকে সরে এল এবং বলল, 'লেটিছিয়া তোমরা ওদের সাহায্য কর, আমার বাঁধনটা খুলে দাও'।

কাঁপতে কাঁপতে ঘরের কোণে দাঁড়ানো বড় মেয়েটি এগোলো বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা লোকটির দিকে ছুরি বা চাকু ছাড়াই।

তার সাথের তরুণীটি ছুটে এসে চাকু কুড়িয়ে নিয়ে তুলে দিল মহিলাটির হাতে।

দরজায় এসে দাড়িয়েছিল সৌম্য দর্শন একজন বৃদ্ধ। ঝড়-বিধ্বস্ত চেহারা তার।

সেই বৃদ্ধের দিকে চেয়ে দু'হাত দিয়ে আহমদ মুসার আহত স্থান ধরে রাখা ডোনা বলল, 'আব্বা, দেখ এদের ফাস্ট এইড বক্স কোথায়, প্রচুর তুলা দরকার। প্রচুর রক্ত আসছে'।

বৃদ্ধটি কিছু করার আগেই মহিলাটির সাথের তরুণীটি বলল, 'মাফ করুন প্রিন্সেস, আমি নিয়ে আসছি।' বলে মেয়েটি ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে।

ডোনা ওপর দিকে মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মাথার রুমালটা আমাকে দাও'।

‘ব্যস্ত হয়ো না ডোনা। ওরা তুলা নিয়ে আসছে’। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা আর কিছু না বলে এক হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে অন্য হাতে রুমাল টেনে নিল মাথা থেকে।

এই সময় ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে তরুণীটি ছুটে এল।

মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটি বাঁধনমুক্ত হয়েছিল।

সে ছুটে এল ডোনার কাছে এবং ঝুকিয়ে ডোনাকে একটা বাউ করে বলল, ‘মাননীয়া প্রিন্সেস আমাদের আর অপরাধী করবেন না। আমাকে দিন। আপাতত চলার মত ব্যান্ডেজ আমি বাঁধতে পারব’।

ডোনা কথা বলল না। মাথাও তুলল না। আহমদ মুসার প্যান্ট হাটু পর্যন্ত ওপরে তুলে অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষ হাতে বাইরের রক্ত মুছে ফেলে এন্টি সেপটিক ক্রিম মাখানো এক মুঠো তুলা আহত স্থানে লাগিয়ে রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল। তুলায় ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছিল এবং ডোনাকে সাহায্য করছিল তরুণীটি। উঠে দাঁড়ালো ডোনা।

‘ডোনা ওকে বসিয়ে দাও সোফায়’। বলল বৃদ্ধটি, ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনি।

‘ধন্যবাদ। আমি ভালো আছি জনাব। লাশগুলোর ব্যবস্থা হওয়া দরকার। পুলিশে খবর দেয়া দরকার কিনা?’ বলে আহমদ মুসা তাকাল সদ্য বাঁধনমুক্ত লোকটির দিকে।

‘পুলিশে খবর দেয়া যাবে না। আমাদের এই বাড়ি থেকে সরে পড়তে হবে এখনি। আর এক ঘন্টার মধ্যে এ বাসায় আক্রমণ হবে বলে আমি আশংকা করছি’। বলল লোকটি।

আহমদ মুসা মুহুর্ত কয়েক লোকটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘আপনি কি ডুপ্লে, ব্ল্যাক ক্রসের লোক?’

প্রশ্ন শুনেই লোকটির মুখ মলিন হয়ে গেল। বলল, ‘জি হ্যাঁ, আমি একজন হতভাগ্য। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমার পরিবারকে বাঁচিয়েছেন। কে আপনি? চিনলেন কি করে আমাকে?’

আহমদ মুসা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ডোনার দিকে, তারপর ডোনার আব্বার দিকে।

ডোনার আব্বার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'সবই জানবে। এতটুকু শুনে রাখ, আমরা দ্বিজন থেকে আসছি। তুমি ডুপ্লের ঠিকানা যেখান থেকে নিয়েছ, আমরাও সেখান থেকে নিয়েছি। তোমার খোঁজ পাবার জন্যেই আমরা এখানে এসেছিলাম। তার পরপরই এই বিপদ'।

'আপনারা দ্বিজনে কেন?' আহমদ মুসার কন্ঠে তখনও বিস্ময়।

'তোমার সন্ধানে'। বলে ডোনার আব্বা তাকাল ডোনার দিকে। আহমদ মুসাও তাকাল ডোনার দিকে।

ডোনা মুখ নিচু করল। বলল, 'এখন কোনো কথা নয়। চলুন, ডাক্তারকে দেখাতে হবে'।

'ঠিকই বলেছে ডোনা। তোমার চিকিৎসা প্রয়োজন। চল আমরা যাই'।

এই সময় ডুপ্লে ছুটে ডোনার আব্বার সামনে এসে বাউ করে বলল, 'সম্মানিত প্রিন্স, আমাকে একটু সময় দিন'। বলে ঝপ করে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর আহমদ মুসার পায়ে কপাল ছুঁইয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার পরম সৌভাগ্য আহমদ মুসাকে আমি দেখলাম এবং আরও সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন'।

'কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না। এ ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ। আর শুনুন, কোন মানুষের মাথা কোন মানুষের কাছে নত হওয়া ঠিক নয়, পা পর্যন্ত তো চলতেই পারে না'। বলল আহমদ মুসা ডুপ্লেকে লক্ষ্য করে।

ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে লেটিছিয়া এবং সেই তরুনী বেরিয়ে এল ড্রইং রুমে।

'চলুন, আমরাও চলে যাব'। বলল ডুপ্লে।

'কোথায় যাবেন আপনারা? আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে'। বলল আহমদ মুসা ডুপ্লেকে লক্ষ্য করে।

'আমি একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে রেখেছি। দু'একদিনের মধ্যেই সেখানে চলে যেতাম। সেখানেই এখন যাব। আপনি কি আমাদের ওখান হয়ে যাবেন কিংবা ঠিকানা রাখবেন?'

‘ঠিকানা দিন। পরে যোগাযোগ করা যাবে’। বলল ডোনা, আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই।

‘না ডোনা, বিষয়টা অন্য একটা দিনের জন্যে ফেলে রাখার মত নয়’। বলল আহমদ মুসা ডোনার দিকে চেয়ে।

একটু থামল। থেমেই আবার ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনারা না হয় চলে যান, আমি ওর বাড়ি হয়ে যাব’।

‘না তা হবে না। আমরাও যাব আপনার সাথে। চলুন’। গলা উপচানো একটা ক্ষোভ ফুটে উঠল ডোনার কন্ঠে। চোখ-মুখটা ভারী হয়ে গেলে তার।

সবাই বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

‘আপনার বোধ হয় গাড়ি নেই’। ডুপ্লের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করর আহমদ মুসা।

‘নেই। কিন্তু এদের মাইক্রোবাসটাই নিয়ে যাব’। বলল ডুপ্লে।

‘ব্ল্যাক ক্রসের এই মাইক্রোবাসটা তো?’

‘জি হ্যাঁ’।

‘না এ গাড়ি আপনার নতুন বাড়িতে নেয়া চলবে না। এতে আপনার নতুন বাড়িটা এদের নজরে পড়তে পারে। তাছাড়া রাস্তায়ও এ মাইক্রোবাস এদের নজরে পড়তে পারে’।

ডুপ্লে বিস্ময়ে বিস্ফোরিত চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক বলেছেন আপনি। আমি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম’।

একটু ঢোক গিলল ডুপ্লে। একটু থেকে সে বলল, ‘এ জন্যেই আপনি আহমদ মুসা। কিছুই আপনার নজর এড়ায় না’।

‘তাহলে মি. ডুপ্লে আমার গাড়িতেই চলুন। অসুবিধা হবে না’। বলল ডোনার আব্বা।

‘ধন্যবাদ। আপনার অনুগ্রহ’।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাচ্ছিল ডোনা বাধা দিয়ে বলল, ‘আপনি অসুস্থ। বিশ্রাম নিন। আমি ড্রাইভ করব’।

‘আমার অনুরোধ ডোনা। আমিই বসি। পাশের সিটে তুমি বস’।

কোন কথা না বলে ডোনা মাথা নিচু করে মুখ ভার করে গাড়ি ঘুরে পাশের সিটের দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিয়েও তা আবার বন্ধ করে দিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে। নেমে পকেট হাতড়িয়ে কিছু খুঁজল। পেল না। গাড়ি ঘুরে ডোনার জানালায় এসে বলল, 'তোমার রুমাল আছে?'

'আছে' বলে ডোনা রুমাল বের করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা রুমাল নিয়ে গাড়ির পেছনে চলে গেল। গাড়ির নাম্বার প্লেটটি সে ঢেকে দিল রুমাল দিয়ে।

ফিরে এল সে তার সিটে। সিটে বসে তাকাল পাশের মাইক্রোবাসটির দিকে। তারপর পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো সেই রিভলবার বের করল। গুলী করল মাইক্রোবাসের সামনের একটা টায়ার লক্ষ্যে। শব্দ করে ফেটে গেল টায়ার।

ভ্রু কুঞ্চিত করল ডোনা। কিন্তু কিছু বলল না। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'রুমালটা কি করলেন?'

'গাড়ির নাম্বার প্লেটটা ঢেকে দিয়েছি ওটা দিয়ে'।

আবার সেইভাবে ভ্রু কুঞ্চিত হলো ডোনার। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। ডোনার আব্বা ও ডুপ্লেসহ সকলের মনেই ডোনার মত প্রশ্ন উকি দিয়েছে। কিন্তু সবাই নীরব থাকল।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন ডুপ্লের বাড়ির গেট দিয়ে বেরুচ্ছে, সেই সময় আহমদ মুসা দেখল, রাস্তা থেকে একটা গাড়ি এদিকে নেমে আসার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। তার সাথে গাড়িটার হর্ন বেজে উঠল কয়েকবার। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আহমদ মুসার। ব্ল্যাক ক্রসের কোডে হর্ন দিয়েছে গাড়িটি।

আহমদ মুসার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠল। ও গাড়িটা নিশ্চয় দেখেছে আমরা ডুপ্লের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি। সুতরাং....।

আহমদ মুসা মুখ না ফিরিয়েই দ্রুত বলল, 'ডোনা এবং আপনারা সবাই মাথা নিচু করুন'। বলে আহমদ মুসা রিভলবারটা তার ডান হাতে তুলে নিল আবার।

ডোনা সামনের গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল এবং আহমদ মুসার মধ্যেকার পরিবর্তনটাও লক্ষ্য করেছিল। এবার আহমদ মুসার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তার বুকের হার্ট বিট বেড়ে গেল। সে উদ্বেগের সাথে আহমদ মুসার আহত পায়ের দিকে তাকাল।

রাস্তা থেকে গাড়িটা নেমে আসছিল নব্বই ডিগ্রি এ্যাংগেলে ডুপ্লের বাড়ির গেটের দিকে।

আহমদ মুসা গেট থেকে বেরিয়ে গাড়ি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এ্যাংগেলে নিয়ে রাস্তায় উঠার জন্যে ছুটল। আহমদ মুসার বাম হাত ছিল স্টেয়ারিং হুইলে এবং ডান হাতে ছিল রিভলবার।

আহমদ মুসার গাড়ির গতি দেখে ঐ গাড়িটাও তার গতি চেঞ্জ করল। আহমদ মুসা বুঝল ওরা গাড়ির সামনে এসে পথটা ব্লক করতে চায়।

আহমদ মুসা গাড়িটাকে সে সুযোগ দিতে চাইল না। প্রথম গুলীটি ছুঁড়ল সে ঐ গাড়িটার সামনের বাম চাকা লক্ষ্য করে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের অবশিষ্ট দু'টি গুলীর একটি এটি। মূল্যবান গুলীটি ব্যর্থ হলো না। টায়ারটি ভীষণ শব্দে ফেটে গেল। গাড়িটি একদিকে কাত হয়ে গেল। গতি স্লো হয়ে গেল গাড়িটির।

এই সুযোগে আহমদ মুসা তার গাড়ি বের করে নিয়ে এল ঐ গাড়িটির সামনে দিয়ে।

আহমদ মুসার গাড়ি ঐ গাড়িটি পার হবার সাথে সাথেই থেমে গেল ঐ গাড়িটি। ডান দিকের দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নামল দু'জন স্টেনগানধারী। নেমেই ব্রাশ ফায়ার করল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে।

কিন্তু এতক্ষণে আহমদ মুসার গাড়ি রাস্তায় উঠে দ্রুত চলতে শুরু করেছে। মাত্র দু'তিনটা গুলী এসে আঘাত করল আহমদ মুসার গাড়ির পেছনটাতে। যা গাড়ির গায়ে কয়েকটা ফুটোর সৃষ্টি করল, কিন্তু টায়ার অক্ষত থাকল।

আহমদ মুসা মোড় ঘুরাবার আগে মুখ বাড়িয়ে পেছনের দিকে চাইল। দেখল, এরা সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডুপ্লের বাড়ির গেটের দিকে ছুটছে। আহমদ মুসা বুঝল ওদের টার্গেট ডুপ্লের গাড়ি বারান্দায় ব্ল্যাক ক্রসের সেই

মাইক্রোবাস। হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ডোনা ওরা মাইক্রোবাসটার জন্যে ছুটছে। ওদের আশা, ঐ মাইক্রোবাসটা নিয়ে আমাদের ফলো করবে’।

স্তম্ভিত ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। এতক্ষণে ডোনা বুঝল কেন আহমদ মুসা মাইক্রোবাসটির টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছিল। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনন্দে হৃদয় ভরে গেল ডোনার।

আরও কিছুটা এগিয়ে জনবিরল একটা জায়গায় রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা। তারপর নেমে গিয়ে রুমালটা খুলে নিয়ে এল গাড়ির নাম্বার প্লেট থেকে।

রুমাল নিয়ে ফিরে ডোনার কাছের দরজায় এসে বলল, ‘ডোনা এবার তুমি ড্রাইভিং সিটে যাও’।

ডোনা মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে ঠোটে এক টুকরো হাসি নিয়ে চলে গেল ড্রাইভিং সিটে।

আহমদ মুসা তার সিটে উঠে বসে পেছন দিকে চাইল। দেখল, ডুপ্লে, তার স্ত্রী এবং তাদের মেয়ে ডোনার আব্বার পাশে গাড়ির সিটে বসে নেই। সিটের নিচে বসে আছে তারা। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘মিঃ ডুপ্লে এবার ডোনাকে আপনার বাড়ির লোকেশন বলুন’।

ডুপ্লের বাড়ির সামনে আহমদ মুসাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল, তখন রাত সাজে দশটা।

গাড়ি থেকে নামল সবাই।

ডুপ্লের নতুন বাসা বহুতল ভরনের একটা ফ্ল্যাট।

প্রবেশ করল তারা ফ্ল্যাটে।

ড্রইং রুম এলোমেলো।

‘ডোনার আব্বা, ডোনা ও আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে ডুপ্লে বলল, আসুন, কোন কিছুই ঠিক অবস্থায় নেই। আপনারা দয়া করে বসুন’।

বসল ওরা তিনজন সোফায়।

ডুপ্লে, ডুপ্লের স্ত্রী ও মেয়ে বসল সোফার সামনে কার্পেটের ওপর।

বসেই বলল ডুপ্লে, 'জনাব আহমদ মুসার সাথে এঁদের পরিচয় করিয়ে দেই'। বলে তার স্ত্রী ও মেয়ের না পরিচয় দিল আহমদ মুসার কাছে।

'জনাব আমৃত্যু আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমরা। আপনি শুধু ডুপ্লেকে নয়, একটা পরিবারকে ধ্বংস থেকে বাচিয়েছেন'। ডুপ্লের স্ত্রী লেটিছিয়া আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল।

'কল্পনা করতে পারি না এতক্ষণ আমাদের কি হতো, কোথায় থাকতাম আমরা। বেঁচে থাকলেও সে জীবনটা হতো মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক'। বলে ডুপ্লের মেয়ে রোসা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর রোসা। যে আল্লাহ তোমার মধ্যে মায়ার সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহই ওকে রক্ষা করেছেন'। বলল আহমদ মুসা।

'আপনি ছিলেন সেই ঈশ্বরের দুত'। বলল রোসা।

'না রোসা, তোমাদের যিশু আমাদের মোহাম্মদ স. এবং এ ধরণের নবী-রসূল যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ঈশ্বরের দূত। আমি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ডুপ্লের দিকে চেয়ে বলল, 'মি. ডুপ্লে আমি আপনার কাছে এসেছি ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার কোথায় তা জানার জন্য। আপনি সাহায্য করলে বাধিত হবো'।

ডুপ্লের মুখ মলিন হয়ে উঠল। বলল, 'আমার খুব কষ্ট লাগছে। আপনি হয়তো ভাববেন আমি মিথ্যা বলছি। এই আমার মেয়ের মাথা ছুঁয়ে বলছি, বলে ডুপ্লে মেয়ে রোসার মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'হেড কোয়ার্টার কোথায় আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি 'একটা ঐতিহাসিক গীর্জা'কে কেন্দ্র করে ওদের হেড কোয়ার্টার গড়ে উঠেছে। গীর্জাটি ইংলিশ চ্যানেলের মুখে আটলান্টিকের তীরে কোন একটি শহরে'।

'ধন্যবাদ মি. ডুপ্লে। আপনাকে বিশ্বাস না করলে আপনার কাছে আসতাম না'।

'মাফ করবেন, আমার একটা প্রশ্ন, আপনি কি করে জানলেন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' কৌতুহল ডুপ্লের চোখে।

'ফিলিস্তিন দূতাবাসে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সে চিঠি পড়ে'।

‘আরেকটি প্রশ্ন’ বলল ডুপ্লে, ‘আমি এখনও বুঝতে পারিনি, কেন আপনি ব্ল্যাক ক্রসের মাইক্রোবাসের টায়ার নষ্ট করলেন এবং কেন গাড়ির নাম্বার প্লেটের ওপর রুমাল লাগিয়েছিলেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। আমি খুব খারাপটাই চিন্তা করেছিলাম, আমরা বের হবার সময়ই ওরা আসবে এবং ওদের সাথে সংঘাত বাঁধবে আমাদের। তারই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম ও দুটি কাজ করে। ওদের গাড়ি নষ্ট হলে যাতে মাইক্রোবাসটি নিয়ে ওরা আমাদের অনুসরণ না করতে পারে সেজন্যই টায়ার নষ্ট করেছিলাম। আমাদের অনুসরণ করতে না পারলে চেষ্টা করবে আমাদের গাড়ির নাম্বার নিয়ে ওয়্যারলেসে তাদের দলের লোকদের জানিয়ে দিতে, যাতে ওরা আমাদের পিছু নিতে পারে। এই পথ বন্ধের জন্যই নাম্বার প্লেট ঢেকে দিয়েছিলাম’।

ডোনার আব্বা, ডোনা, ডুপ্লে, তার স্ত্রী ও মেয়ে রোসা অভিভূতের মত তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

‘আজ বুঝলাম দুনিয়ায় এত বড় বড় কাজ আপনি কিভাবে করেছেন। বুঝলাম, ব্ল্যাক ক্রসের প্রায় তিন ডজন লোক আপনার হাতে মরল কি করে’। নীরবতা ভেঙে বলল ডুপ্লে।

‘ঈশ্বর ওকে দিয়ে করান। তা না হলে খালি হাতে এভাবে সশস্ত্র তিনজনকে কুপোকাত করা অবিশ্বাস্য’। বলল রোসা।

‘ঠিক বলেছ তুমি রোসা’। হেসে বলল আহমদ মুসা। তারপর ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে বলল, ‘জনাব আমার কাজ শেষ। আমরা এবার উঠতে পারি’।

‘চল উঠি’। বলে ডোনার আব্বা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, ‘মি. ডুপ্লে আপনার পরিকল্পনা কি? ব্ল্যাক ক্রসের সাথে এবার আপনার প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হলো’।

মুখ ম্লান হয়ে গেল ডুপ্লেসহ তার স্ত্রী ও মেয়ে সকলের।

‘ঠিক করেছি, আজ ভোরের মধ্যেই বৃটেন চলে যাব। সেখান থেকে আমেরিকা। আমেরিকায় ব্ল্যাক ক্রসের কাজ কম। ওখানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান শক্তিশালী’। শুকনো কন্ঠে বলল ডুপ্লে।

‘আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ডুপ্লে। আমরা তোমার শুভ কামনা করছি’। বলল ডোনার আব্বা।

ডোনার আব্বা ও ডোনা দরজায় পৌছে গিয়েছিল বাইরে বেরুবার জন্যে। ডুপ্লেরা তিনজন মাথা নিচু করে শরীর সামনে ঝাঁকিয়ে বাউ করল ডোনার আব্বা ও ডোনাকে। তাদের চোখে সম্মান ও শ্রদ্ধা ঠিকরে পড়ছিল। আহমদ মুসা আগের মতই বিস্মিত হলো সম্মান প্রদর্শনের এই বাদশাহী কায়দা দেখে। আবার আহমদ মুসা যখন চলে আসছিল, তখন সাধারণভাবেই তাকে বিদায় দিল ‘গুড ইভিনিং’ বলে। এই পার্থক্য আহমদ মুসাকে খুবই বিস্মিত করল।

সামনে হাঁটছিল ডোনা ও ওর আব্বা। ওরা লিফটের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। আহমদ মুসার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবে হাঁটার চেষ্টা করেও খোঁড়াতে হচ্ছে তাকে।

হঠাৎ ডোনা পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। ছুটে এল সে। একটা হাত ধরে বলল, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার? ধরি আপনাকে একটু?’ নরম বেদনাভরা কন্ঠ ডোনার।

‘আমাকে নির্ভরশীল করো না ডোনা। তোমাকে তো সব জায়গায় পাব না’। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘আমার সে যোগ্যতা নেই। কিন্তু যতটুকু পারি করতে দেবেন না?’ ভারী কন্ঠে বলল ডোনা।

‘অতটা অচল হইনি। সে রকম হলে তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করেই ধরে ফেলতে’।

ডোনার আব্বাও দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসারা সেখানে এলে বলল, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে আহমদ মুসা?’

‘জি না। সেই অর্থে কোন কষ্টই হচ্ছে না জনাব’।

লিফটে নেমে এল ওরা নিচে।

লিফট থেকে নেমে ডোনা আহমদ মুসার হাত ধরতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা হাতটা টেনে নিয়ে মাথা চুলকালো। যেন মাথা চুলকাবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়েছে।

কিন্তু ডোনার কাছে ব্যাপারটা বোধ হয় ধরা পড়ে গেছে। সে একবার চকিতে আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে চাইল। আহমদ মুসা দেখল ডোনার মুখে ক্ষোভের চিহ্ন।

'ডোনা গাড়িতে টেলিফোন আছে?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল আহমদ মুসা।

'আছে, কেন?'

'ফিলিস্তিন এমবেসিকে গাড়ির জন্যে বলতে হবে। তোমাদের গাড়ি নিয়ে এমবেসিতে যাওয়া ঠিক হবে না'।

'এমবেসিতে যেতে হবে কেন?' ক্ষোভ এবং গম্ভীর কণ্ঠ ডোনার। গাড়ির কাছে সবাই এসে পৌছল।

'কে এমবেসিতে যাবে?' জিজ্ঞেস করল ডোনার আব্বা ডোনাকে।

ডোনা কোন উত্তর দিল না।

মাথা নিচু করে সে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। আষাঢ়ের মেঘের মত তার মুখ থমথমে।

'আমি বলছিলাম এমবেসিতে ফেরার কথা'। আহমদ মুসা বলল।

'কেন? এমবেসিতে কেন?'

'ছিলাম তো ওখানে। আর আপনাদের কষ্ট দেয়া হবে'।

হাসল ডোনার আব্বা মি. মিশেল প্লাতিনি। বলল, 'কোনটা আমাদের জন্যে কষ্টের হবে? তোমার আমাদের সাথে যাওয়া বা না যাওয়া? বল তো তুমি?'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। উঠে বসল ডোনার ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে।

ডোনার আব্বা পেছনের সিটে উঠে বসেছে।

ডোনা দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে চুপ করে বসে আছে।

'কই চল মা?' বলল ডোনার আব্বা পেছনের সিট থেকে।

‘কোথায় আব্বা?’

‘কেন বাড়িতে?’

‘উনি তো কিছু বলেননি’। মুখ নিচু রেখেই গম্ভীর কন্ঠে বলল ডোনা।

‘পাগল মেয়ে। সব কথা ধরতে হয়। এমবেসিতে ছিল, ওখানে ফেরার কথা তো বলবেই। আমি এখনি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি, আহমদ মুসা আমার ওখানে থাকছে’। ডোনার আব্বার মুখে স্নেহপূর্ণ হাসি।

আহমদ মুসা ডোনার আষাঢ়ে মুখের দিকে চাইল। কিছু বলল না। চাপা গর্জন করে উঠে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল বাড়ি। কিছু দূর এগোনোর পর ডোনা বলল, ‘আব্বা ডাক্তারকে বলে দাও আমরা বাড়িতে পৌছেই যেন তাঁকে পাই’।

‘ঠিক বলেছ মা’। বলে টেলিফোনটা পাশ থেকে আবার তুলে নিল।

এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে ডোনা। একবারও সে ফিরে তাকায়নি আহমদ মুসার দিকে। অবস্থা অন্ধকারেই দেখা যাচ্ছে তার সে আষাঢ়ে মুখের কোন পরিবর্তন হয়নি।

আহমদ মুসার ঠোঁটে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। ভাবল, ডোনার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই প্রচন্ড অভিমানী আর জেদী এখনও সে। তবে রক্ষা যে, এই রাজকীয় অভিমান ও জেদের পাশে রাজকীয় ধরনের বড় একটা মন তার আছে বলেই তার জেদ ও অভিমানটাও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

একটা বিশাল গেটের সামনে এসে গাড়ির গতি স্লো হয়ে পড়ল।

‘আমরা এসে গেছি’। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল ডোনা।

‘ধন্যবাদ’। বলল আহমদ মুসা।

বিশাল গেট পেরিয়ে বিরাট চত্বরের সুন্দর বাগানের মধ্যে দিয়ে বিরাট একটা রাজকীয় ভবনের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে বাড়ি থামল।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো বিরাট গাড়ি এবং তার বিশাল এরিয়া দেখে। এমন বাড়ি তো দূরে থাক, প্যারিসে ডোনাদের কোন বাড়ি আছে বলেও আহমদ মুসা জানতো না।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই ডোনা নেমে পড়ল। তারপর গাড়ি ঘুরে আহমদ মুসার দরজার সামনে এল। আহমদ মুসা ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছিল। বাম পাটা নামিয়ে দিয়েছিল। ডান পাটা নাড়তেই ব্যথা করে উঠল।

ডোনা এসে আহমদ মুসার একটা হাত ধরে নামিয়ে নিল তাকে গাড়ি থেকে।

'ধন্যবাদ ডোনা। পা'টা সত্যিই কাজ করছে না'।

'গালি দিন, ধন্যবাদ দেবেন না। জোর করে নিয়ে এসেছি'। ফিস ফিস করে বলল ডোনা। একটু থামল। তারপর কণ্ঠ একটু চড়িয়ে বলল, 'আঘাতটা ডিপ ছিল, তাই বেদনা একটু বেশি হবেই'।

আহমদ মুসাকে নিয়ে ডোনা ও তার আব্বা লিফটের দিকে এগিয়ে চলল।

দু'পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী মাথা নত করে শরীর বাঁকিয়ে বাউ করল তাদের। যেন রাজারা ঢুকছেন রাজ দরবারে।

এই দৃশ্য আগের মতই বিস্মিত করল আহমদ মুসাকে।

২

আহমদ মুসার ঘরের বন্ধ দরজায় নক করল ডোনা। তিনবার নক করার পর দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে ডোনা বলল, 'আসতে পারি?'

'এস'। ভেতর থেকে ভেসে এল আহমদ মুসার কন্ঠ।

ঘরে প্রবেশ করল ডোনা।

পেছন থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ডোনা থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'ও হো দরজা তো বন্ধ হওয়া চলবে না'। বলে ফিরে এসে ডোনা দরজা খুলল এবং খুলে রাখল।

দরজা থেকে ফিরে আসতে আসতে ডোনা বলল, 'সত্যিই কি এর প্রয়োজন আছে? আমরা কি একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারি না? দরজা খোলা রেখে লোকভয়ের পাহারা দাঁড় করাবার সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে কিনা?'

'শুধু আমাদের বিশ্বাসের প্রশ্ন নয় ডোনা, অন্যের বিশ্বাসের কথাও আমাদের ভাবা উচিত। লোকভয়ের পাহারার কথা বলছ কেন, দরজা খোলা রাখার অর্থ অন্যের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দরজা বন্ধ রাখা। তোমাকে আরেকটা কথা ভাবতে হবে, দুনিয়ার সবাই আমি এবং তুমি এক অবশ্যই নই। তাছাড়া বন্ধ ঘরে আমি তুমি একা থাকি না। আরেকজনও থাকে। সে হলো শয়তান। বন্ধ দরজা তাকে সাহায্য করতে পারে আমাদের পরাজিত করার জন্যে'।

আহমদ মুসার কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ডোনার মুখ। আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও ডোনার বিস্মিত-বিমুগ্ধ দৃষ্টি আটকে থাকল আহমদ মুসার চোখের ওপর। কিছুক্ষণ পর বলল, 'সব বুঝার বিরাট অহমিকা আমার আজ আপনি ভেঙে দিলেন। এই মুহুর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমাকেই আমি খুব বেশি চিনি না। আমি বুঝতে পারছি, আপনি যে শয়তানের কথা বললেন, তা তো আমার আপনার সকলের মধ্যেই আছে। সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে বীভৎস রূপ নিয়ে। এই নতুন বোধ জাগিয়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ'।

বলে ডোনা হাতে করে নিয়ে আসা একটা বই আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'এটাই মিনিং অব দি কুরআন। এর সবগুলো ভলিয়ম পড়ে আমি শেষ করেছি'।

আহমদ মুসা বইটা হাতে নিয়ে বলল তোমার চয়েসটা সুন্দর হয়েছে ডোনা। কুরআনের যতগুলো ইংরেজি তাফসীর আছে, তার মধ্যে এটাই সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

'কুরআনের তাফসীর পড়তে গিয়ে একটা ছোট বিষয় আমার কাছে আজকের দুনিয়ার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেটা হলো পরিবার ব্যবস্থা। আজ আমাদের মত দেশের সমাজগুলোতে পরিবার ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসই হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে দিয়ে এবং একে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির সাথে অবিচ্ছেদ্য করে দিয়ে মানুষের পরিবার ব্যবস্থাকে অক্ষয় করে দিয়েছে'।

'একে তুমি ছোট বিষয় বলছ কেন ডোনা? মানুষের ইহজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এই পরিবার। এ জন্যেই পৃথিবীর শয়তানী শক্তি এর প্রতি আঘাত করার মাধ্যমেই মানুষ ও মানব সমাজকে বিকৃত করতে চেয়েছে এবং এখনও সে চেষ্টাই করছে'।

থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার প্রশ্ন করল ডোনাকে, 'একটা ছোট প্রশ্ন করি তোমাকে ডোনা?'

'করুন'।

'সমাজ ও পরিবারে নারীদের যে স্থান চিহ্নিত করেছে কুরআন, সে ব্যাপারে তোমার মত কি?'

হেসে উঠল ডোনা। বলল, এটা ছোট প্রশ্ন বুঝি। এটা নিয়েই তো তোলপাড় হচ্ছে গোটা দুনিয়া'।

হ্যাঁ, প্রশ্নটাকে বড়ও বলতে পার, আবার ছোটও বলতে পার'।

'ঠিক বলেছেন। প্রশ্নটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। সুরা নিসা ও সুরা নুরসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশ বার বার পড়েছি এবং বর্তমান অবস্থার আলোকে

বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা করতে গিয়ে আমি দেখেছি, আমাদের ইউরোপ যখন নারীকে মানুষ মনে করতো না এবং যখন নারীকে শয়তানের বাহন মনে করতো, সেই সময় কুরআন 'মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশত' বলে নারীকে পুরুষের চেয়ে উঁচুতে স্থান দিয়েছে। আবার 'স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অভিভাবক' বলে তাদের সমমর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। কিন্তু আবার বিভিন্ন দিকের বিবেচনায় আমার মনে হয়েছে নারী বঞ্চনার শিকার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়াই আমার এই মনে করার কারণ। আমি অনেক চিন্তা করেও এই বৈষম্যের যৌক্তিকতা পাইনি। অবশেষে এই যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পেয়েছি চারপাশের প্রকৃতি থেকে এবং তা পেয়েছি একটা ঘটনার মাধ্যমে। একদিন আমি ভিডিওতে 'সাগর বক্ষের জীব' এ ধরণের প্রকৃতি বিষয়ক একটা ফিল্মে দেখলাম, একটা পুরুষ অক্টোপাশ নারী অক্টোপাশকে তাড়া করছে এবং নারী অক্টোপাশ ক্লান্ত হবার পর পুরুষ অক্টোপাশ তাকে বশে নিয়ে এল। ঐ ফিল্মের জানলাম, এটাই অক্টোপাশদের জীবন-প্রকৃতি। এই ঘটনায় হঠাৎ একটা নতুন দৃষ্টি আমি লাভ করলাম। দেখলাম প্রাণী জগতে সর্বত্র এই একই দৃশ্য। একে কি আমি বৈষম্য বলব? মানুষের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি না হয় ধরা যাক কুরআন কিংবা অন্য কোন ধর্ম করল, কিন্তু প্রাণী জগতের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য সৃষ্টি কে করল? উত্তর পেলাম এ বৈষম্য প্রকৃতি থেকেই। এ বৈষম্য কেউ করেনি। এটাই প্রকৃতি। মানুষও এক ধরণের প্রাণী। সুতরাং মানুষের নারী-পুরুষের মধ্যকার এই পার্থক্যটাও প্রাকৃতিক। এই উপসংহার থেকেই আমি পারিবারিক ও সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনে উল্লেখিত পুরুষের অগ্রাধিকারের যুক্তি খুঁজে পেয়েছি'। থামল ডোনা।

তার দিকে বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ ডোনা। চমৎকার যুক্তি তুমি এনেছ। এ দিকটির দিকে সম্ভবত খুব অল্প মানুষই দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেমন বোনের চেয়ে ভাই পিতার সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ পায়, আল কুরআনের এই বিধানটাকে তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখ?'

‘আমার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে বুঝি?’ মুখ টিপে হেসে বলল ডোনা।

তারপর আহমদ মুসার সামনে বসা ডোনা সোফায় একটু নড়েচড়ে বসে গম্ভীর কন্ঠে বলল, ‘প্রথমে ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই আপত্তিকর ঠেকেছিল। একদিন আমি আমার কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ বিষয়ে। তিনি বললেন, ‘এই ধরণের ভাগের কথা শুনতে খারাপই লাগে। কিন্তু এর বুনিয়াদ তো মানব মনের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। মানব সমাজ-তত্ত্বের গোটা ইতিহাস ঘাটলে তুমি দেখবে অনুল্লেখযোগ্য ও অস্বাভাবিক কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মেয়েরা বিয়ের পর পিতার পরিবার ছেড়ে স্বামীর পরিবারের একজন হয়ে গেছে, আর ছেলেরা গ্রহণ করেছে পিতামাতার দায়িত্ব। পিতামাতাও তাদের ছেলের সংসারকেই নিজের সংসার মনে করে, মেয়ের সংসারকে নয়। আজ আমাদের পাশ্চাত্য সমাজ ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানের পার্থক্য মুছে ফেলার শত চেষ্টার পরেও পিতামাতারা তাদের জামাই বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে না। আমার কথাই ধর, তোমার মতই আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিয়ের পর স্বামীর সাতে স্বতন্ত্র বাড়িতে উঠে এলাম। আমার স্বামীর আব্বা-আম্মা অন্য এক শহরে থাকতেন তাদের আরেকজন ছেলের সাথে। আমি আমার বৃদ্ধ আব্বাকে আমাদের সাথে থাকতে বলেছিলাম। তিনি রাজি হননি। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদেরকে তার সাথে গিয়ে থাকতে। কিন্তু আমার স্বামী এটা মেনে নিতে পারেনি। এ নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় আমি একাই আবার আব্বার কাছে চলে যাই। আমি আমার স্বামীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আব্বা বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাকে বিয়ে বহির্ভূত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিতে দেব না। যদি তাই হয়, যদি আবার বিয়ে কর তুমি, তাহলে নতুন জামাই এখানে এসে থাকবে, এই গ্যারান্টি তুমি দিতে পার না। সুতরাং এই ইস্যুতে স্বামীকে তালাক দেয়া তোমার ঠিক হবে না। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও। আমার কথা ভেব না। আমি ঠিক করেছি, ভাতিজা ‘জন’ আমার এখানে থেকে কলেজে পড়বে। বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরে এসেছিলাম। সুতরাং দেখ, আমি আর্থিকভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার পরেও পিতার সংসারকে আমি আপন সংসার বানাতে

পারিনি এবং পিতা আমার সংসারকে তার সংসার বানাতে পারেনি। ডোনা, এই বাস্তবতার কারণেই মোহামেডানদের পরিকল্পিত সমাজে ছেলে সন্তানকে পিতামাতার সম্পদের বেশি অংশ দেয়া হয়েছে মেয়ে সন্তানের চেয়ে'। থামল ডোনা। হাসল সে।

হেসে বলল, 'ম্যাডাম যে কথা বলেছেন, সেটা আমারও কথা'।

আহমদ মুসার মুগ্ধ দৃষ্টি ডোনার ওপর নিবদ্ধ। ফুলহাতা শুভ্র গাউন পরেছে ডোনা। মাথায় শুভ্র রুমাল। রুমালের নিচের প্রান্তদ্বয় গলায় পেঁচানো। ডোনার চোখে-মুখেও একটা শুভ্র পবিত্রতা।

আহমদ মুসা তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বলল, 'ডোনা, আমার মনে হচ্ছে কি জান, তোমরা ইউরোপীয়রা যদি ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা কর, তাহলে আমাদের চেয়ে ভালো বুঝতে পারবে। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে ইসলামের আহ্বানকে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার সাথে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করতে পারবে'।

'ধন্যবাদ। কিন্তু সূর্য বুঝি চাঁদের এভাবে প্রশংসা করতে পারে?' একটা বিচ্ছুরিত আবেগ ঠিকরে পড়ছে ডোনার চোখ-মুখ থেকে।

'তোমরা চাঁদ, কে বলল ডোনা? প্রতিটি মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবিকতার অধিকারী। প্রত্যেকেই একেকটি সূর্য'।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল গম্ভীর কন্ঠে, 'সত্যি বলছি ডোনা, তোমরা পাশ্চাত্যের লোকেরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক মানে পৌছেছ তার সাথে ইসলামের শিক্ষা যদি যুক্ত হয় তাহলে আজ হতে পার তোমরা দুনিয়ার শিক্ষক'।

'ধন্যবাদ আপনাকে। বড় যারা তারা ছোটদের এভাবে বড় করেই ভাবে'। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল ডোনা।

'না ডোনা, বড়রা বড়দেরই চিহ্নিত করে'।

'কিন্তু ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার মত বুদ্ধি কি পাশ্চাত্যের আছে?'

'ডোনা তো পাশ্চাত্যেরই একজন'।

'আহমদ মুসা কি পাশ্চাত্যের পথভ্রষ্ট সব ডোনার কাছে যেতে পারবেন?'

হাসল আহমদ মুসা।

কিন্তু গাম্ভীর্য নেমে এল তার মুখে সব মুহূর্তেই। বলল, ‘ঠিক বলেছ ডোনা। ইসলামের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এটাই। পাশ্চাত্যের কাছে তার আহ্বান পৌঁছাবার উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের বড় অভাব’।

‘তাহলে কি দাঁড়াল, অভাব কি আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়ার মত উপযুক্ত মনের, না অভাব আহ্বান পৌছাবার মত উপযুক্ত মানুষ ও মনের?’

‘দ্বিতীয়টাই ঠিক ডোনা। আহ্বান উপযুক্ত হলে আজকের ইউরোপে আদর্শিক শূণ্যতায় আহ্বান গ্রহণের উপযুক্ত মন সহজেই সৃষ্টি হতে পারে’।

‘ধন্যবাদ’। বলল ডোনা।

বলে ডোনা উঠে দাঁড়াল। বলল, এখন কি করবেন?

‘কেন বলছ?’

‘চলুন ঘুরে আসি। আমাদের বেজমেন্টেতো যাননি। মজার কিছু জিনিস আছে’।

‘মাটির তলায় কতগুলো রুম আছে তোমাদের? বিল্ডিং-এর সবটা জুড়েই কি?’

‘বলা যায়’।

‘চল যেতে পারি’। বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ডোনা ও আহমদ মুসা পাশাপাশি হাঁটছিল।

‘বেজমেন্টে তো অবশ্যই কেউ থাকে না?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভয় নেই, ওখানে এখন আব্বা আছেন’। ঠোঁটে একটা দুষ্টুমির হাসি টেনে বলল ডোনা।

‘নিশ্চয় উনি কাজে আছেন, আমরা তাকে বিরক্ত করবো না তো?’

‘কাজ কি! প্রতিদিন একটা সময় তিনি বেজমেন্টে কাটান’।

বাড়ির অভ্যন্তরের একটা স্বতন্ত্র লিফটে তারা মাটির তলায় একটা হলঘরে গিয়ে নামল।

হলঘরেই মাঝ বরাবর একটা টেবিলে বসে কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিল ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনি।

তারা লিফট থেকে নামতেই ডোনার আব্বা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আজকেই মনে করেছিলাম তোমাকে আমাদের ফ্যামেলি জাদুঘরে নিয়ে আসব। এসে ভালো করেছ'।

'না আব্বা, উনি আসেননি। আমি নিয়ে এসেছি'।

ডোনার আব্বা হাসল। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ ওকে নিয়ে আসার জন্যে'।

বলে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'আমার এই মা'র কিছুর অভাব নেই, ভিখারী শুধু স্নেহের এবং প্রাপ্য স্নেহ সে আদায় করে ছাড়ে'।

'ভিখারী বললে আব্বা? আমি তো ঋণ গ্রহণ করি না, প্রাপ্য নেই'।

'স্নেহের মতে বিষয়গুলো কি বিনিময় যোগ্য পণ্য? তা না হলে প্রাপ্য হয় কি করে?'

'হয়। একতরফা কাজে আমি বিশ্বাস করি না। এখানেই প্রাপ্যতার প্রশ্ন আসে। তবে আপনার 'পণ্য' শব্দ ব্যবহারের সাথে আমি একমত নই'।

'কেন?'

'স্নেহের মত অরূপ জিনিসগুলো পরিমাপ যোগ্য নয়, টাকার অংকে বিনিময় যোগ্য নয়। সুতরাং পণ্য শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে অমর্যাদাকর'।

ডোনার আব্বা হাসল। বলল, 'তোমাকে ব্যারিষ্টার না বানিয়ে ভুলই করেছি। যাক, মা তুমি আহমদ মুসাকে জাদুঘরের জিনিসগুলো দেখাও'।

লিফট থেকে আহমদ মুসারা যে হলে নেমেছে, সেটা বিরাট একটা হলঘর। হলের চারদিকের দেয়াল জুড়ে শোকেস। হলের মধ্যখানে ডিম্বাকৃতি আরেকটা শোকেস।

ডোনা আহমদ মুসাকে নিয়ে শোকেসের দিকে এগোলো।

শোকেসগুলোতে পরিধেয় বস্ত্রাদি, জুতা থেকে শুরু করে শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত নানা উপকরণ, অলংকারাদি এবং হাতে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কয়েকটি শোকেসে আহমদ মুসা দেখল ফ্রান্সের সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী ও ত্রয়োদশ লুইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপকরণাদি। তার সাথে তাঁর একটা তৈলচিত্র।

এভাবে সে পরবর্তী শোকেসগুলোতে দেখল সম্রাট চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই, ষোঢ়শ লুইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈলচিত্র, ব্যবহার্য উপকরণাদির সংগ্রহ। আহমদ মুসা মনে মনে হিসেব করল ফরাসি বিপ্লবোত্তর ২০ বছরের ইতিহাস বাদে ২৩৫ বছরের ইতিহাস সংরক্ষণ করা হয়েছে এখানে। এই সময়ে ফ্রান্সে বুরবো রাজবংশে রাজত্ব করেছে। লুই সম্রাটেরা এই বংশেরই শাসক ছিলেন।

আহমদ মুসা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ডোনার দিকে। বলল, 'এতো দেখছি বুরবো সম্রাটদের স্মৃতির সংরক্ষণ'।

'আপনি বুরবোদের ইতিহাস জানেন?' বলল ডোনা।

'ইতিহাস যখন, কিছু তো জানতেই হবে'।

'কেমন লাগে সে ইতিহাস?'

'সম্রাট অষ্টাদশ লুইকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী। গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর উদ্বেগ ও কাজকে ইতিহাস কোনদিনই ভুলবে না'।

'ইউরোপীয় ইতিহাসের এত বিস্তারিত খবর রাখেন আপনি?'

আহমদ মুসা ডোনার প্রশ্নের দিকে না গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুরবো সম্রাটদের সবার স্মৃতি এখানে ধরে রাখা হয়েছে, কিন্তু শেষ সম্রাট দশম চার্লসের কোন কিছু এখানে নেই কেন?'

'দশম চার্লসকে আমরা বুরবো বলে মনে করি না। তাঁকে আমরা ভুলতে চাই'।

'কেন?'

'সম্রাট অষ্টাদশ লুইয়ের উত্তরাধিকারী ফরাসী গণতন্ত্রের মানসপুত্র যুবরাজ ডিউক ডি বেরী লুইকেই সে শুধু হত্যা করেনি, হত্যা করেছিল ফরাসী গণতন্ত্রকে'। বলল ডোনা।

ডোনার আব্বাও এ সময় তাদের সাথে এসে যোগ দিল।

আরেকটু সামনে এগোলো তারা।

শুরু হলো অশাসক বুরবোদের চিত্র কাহিনী।

প্রথমেই দুটি শোকেসে নিহত যুবরাজ ডিউক ডি বেরীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈলচিত্র ইত্যাদি।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, শুধু বুরবো রাজবংশ ছাড়া ফ্রান্সের আর কোন রাজবংশের স্মৃতি সংরক্ষণ এখানে করা হয়নি। আহমদ মুসা ডোনার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুরবো রাজ বংশের আগে আরও তো রাজবংশ ছিল, তাদের কোন চিহ্ন ও স্মৃতি তো এখানে দেখছি না?'

'কারণ এটা আমাদের ফ্যামিলি জাদুকর'। বলল ডোনা।

'ফ্যামিলি জাদুঘরে কি শুধু এক রাজবংশের কথাই থাকতে হবে?'

'তুমি যে অর্থে ভাবছ, সে অর্থে সে রকম কোন ফ্যামিলি জাদুঘর এটা নয়। এখানে আমরা আমাদের পরিবারের অতীতকেই শুধু ধরে রাখার চেষ্টা করেছি'। বলল ডোনার আব্বা।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে নেমে এল এক রাশ বিস্ময়। বলল, 'অর্থাৎ আপনারা বুরবো রাজবংশের মানে বুরবো রাজাদের আপনারা উত্তর পুরুষ?'

ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনির ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'এটাই ইতিহাস'।

বলে মি. প্লাতিনি আহমদ মুসাকে আরেকটু সামনে এগিয়ে নিয়ে একটা বড় শোকেসের সামনে দাঁড় করালো।

শোকেসটিতে ফ্রান্সের বুরবো রাজবংশের বিস্তৃত বংশ তালিকা। ১৫৮৯ সালে সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী থেকে এই রাজবংশের শুরু। বংশ তালিকায় প্রথম নাম সম্রাট ষষ্ঠ হেনরীর। বংশ তালিকায় প্রত্যেক নামের সাথে ছবি রয়েছে।

গোটা বংশ তালিকার ওপর নজর বুলালো আহমদ মুসা। সর্বশেষ নাম সে দেখল 'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই'। তার আগের নাম প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি লুই। আহমদ মুসা বুঝল প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি লুই ডোনার আব্বা। কিন্তু শেষ নামের সাথে যে ফটো সে দেখেছে, সেটা ডোনার, কিন্তু নাম মেলে না।

আহমদ মুসা ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই কে?'

'ওটাই ডোনার পারিবারিক নাম'। হেসে বলল ডোনার আব্বা।

উত্তরটা দিয়েই ডোনার আব্বা ডোনার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি ওপরে যাচ্ছি, ওষুধ খেতে হবে। লিফটের পাশের ঘরে দু'জন কনডিশনার কাজ করছে। ওদের চেকিং-এর কাজ হয়ে গেছে। ক'মিনিট পরে ওরা চলে যাবে। ওদের বিদায় দিয়ে পরে তোমরা এস'।

বলে ডোনার আব্বা লিফটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

চলে গেল ডোনার আব্বা।

ডোনার চোখে-মুখে কিছুটা লজ্জা ও বিব্রতকর অবস্থার ছাপ।

ডোনার আব্বা চলে যেতেই আহমদ মুসা মাথা নিচু করে শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করল ডোনাকে এবং বলল, 'তাই তো বলি, ডুপ্লেরা তোমাদেরকে অত 'বাউ' করছিল কেন, কেন ডুপ্লেরা তোমার আব্বার পাশে গাড়ির সিটে বসেনি এবং কেন ডুপ্লেরা ড্রইং রুমে সোফায় না বসে কার্পেটে বসেছিল। প্রশ্ন তখনি মনে জেগেছিল আমার। জবাব পাইনি'।

ডোনার মুখটা আরও লাল হয়ে উঠেছে। বলল, 'আব্বা, আমি-আমরা কেউ চাই না, আমাদের সাথে ওরা এই আচরণ করুন। আমরা তাদের পাশে বসাতে চাই। প্রজার স্টাইলে বাউ করতে আমরা নিষেধ করি সব সময়। কিন্তু কেউ শুনে না। আমরা কি এর জন্যে দায়ী?' ডোনার কন্ঠে প্রতিবাদের সুর।

'নিষেধ করবে কেন? ওরা তো অন্যায় কিছু করছে না। একটা বাস্তবতাকেই তারা স্বীকৃতি দিচ্ছে মাত্র'।

'আপনিও বিদ্রুপ করছেন? যে যা নয় তাকে তা বলা তার জন্যে অপমানকর'।

'তুমি কি বুরবো বংশের রাজকুমারী নও?'

'কুমারী, কিন্তু রাজকুমারী নই। ওদের সাথে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সাদৃশ্য নেই'।

‘এটা তোমার কথা। মানুষের কথা নয়। মানুষের কাছে তুমি বুরবো বংশের রাজকুমারী। মানুষের কাছে মর্যাদা তোমাদের এ কারণেই’।

‘এ মর্যাদা আমরা কারও কাছে কখনও চাইনি’। ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল ডোনা।

‘চাওনি বলেই নিষেধও করতে পার না’।

‘সুতরাং মুখ বুজে আপনার ‘বাউ’ গ্রহণ করে আমাকে প্রিন্সেস সেজে বসে থাকতে হবে বুঝি’। ডোনার কন্ঠে প্রচন্ড ক্ষোভ।

‘একটা বাস্তবতাকে তুমি অস্বীকার করতে চাইছ কেন ডোনা?’

‘আমি ‘ডোনা’ আমি ‘মারিয়া’ হতে চাই না’। ডোনার কন্ঠে ক্ষোভের উত্তাপের চেয়ে এবার অশ্রুর সিক্ততা বেশি।

‘মারিয়া ও ডোনার মধ্যে সংঘাত কোথায় ডোনা?’

‘মারিয়া রাজকুমারী, বুরবোদের এক ধ্বংসাবিশেষ। আর ডোনা আপনার অনেক পরিচিত এক নির্দোষ বালিকা’। আবেগে কাঁপল ডোনার কন্ঠ।

‘কিন্তু ডোনা, মারিয়ার মধ্যে তো আমি কোন দোষ দেখি না। রাজকুমারী হওয়া তার কোন অপরাধ নয়’।

‘কেন, বুরবোদের রক্তাক্ত রাজদন্ড কি রাজকুমারী মারিয়াকেও স্পর্শ করে না?’

‘যার ধর্ম শুধু তার ওপর বর্তায় ডোনা, রক্তের ওপর বর্তায় না। তাছাড়া বুরবোদের রক্তাক্ত রাজদন্ডকে তোমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ বুরবো যুবরাজ ডিউক ডি বেরী নিজের রক্ত দিয়ে মুছে দিয়ে গেছেন। বুরবোদের সর্বশেষের এই গৌরব রাজকুমারী মারিয়াকেও উজ্জ্বল করেছে’।

‘আপনি ভালো, তাই ভালোটাই আপনি দেখতে পান। কিন্তু সত্যই কি বুরবোদের প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই ডোনা জোসেফাইনকে অপরিচয়ের অন্ধকারে ঠেলে দেয় না?’ ভেজা কন্ঠ ডোনার। তার দু’চোখ থেকে দু’ফোটা অশ্রু নেমে এল তার দু’গন্ড বেয়ে।

‘এই নতুন পরিচয় ডোনাকে আমার কাছে আরও সুন্দরতর করেছে’।

ডোনা দুহাতে মুখ ঢাকল। কয়েক মুহুর্ত চুপ থাকল। তারপর বলল, ‘বাঁচালে তুমি আমাকে’।

আহমদ মুসা শোকেসগুলোর দিকে মনোযোগ দিল। ডোনা ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালে আহমদ মুসা বলল, ‘বাঁচলে কি করে ডোনা?’

এতক্ষণে হাসল ডোনা। বলল, ‘সবকিছু আপনাকে জানতে হবে না’।

‘সব কিছু জানব না কিন্তু কিছু তো জানতে পারি?’

‘কি?’

‘তুমি’ কিংবা ‘আপনি’ যে কোন একটা বলা দরকার। দুটোই তো বলছ তুমি’।

‘কখনও না, আপনার সাথে এ বেয়াদবী করতে পারি না’।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। মুখোমুখি হলো ডোনার। বলল, ‘এই তো এখনি বললে’।

ডোনা মুখ নিচু করল।

মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘মাফ করবেন। হয়তো হয়ে গেছে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম’।

‘মাফ চাইছ কেন? অপরাধ মনে করছ?’

‘তা নয়, কিন্তু....’।

কথা শেষ করেই হলের ও প্রান্তের দিকে চেয়ে বলল, ‘ঐ যে কন্ডিশনাররা চলে গেল। চলুন আমরা যাই’।

বলে হাঁটা শুরু করল ডোনা।

আহমদ মুসাও চলল।

উপরে উঠে গেল তারা লিফটে।

ফ্যামিলি জাদুঘরের লিফট রুমটা মি. প্লাতিনি ও ডোনার বেডরুমের মাঝখানের করিডোর।

ডোনার বেডরুমের সামনে এসে আহমদ মুসা বলল, ‘আসি ডোনা’।

‘চলুন, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি’।

চলতে শুরু করল দু’জনে।

দু'জনেই নীরবে মাথা নিচু করে হাঁটছিল। এক সময় ডোনা তার চোখ নিচু রেখেই বলল, 'আপনার প্রশ্নের জবাব পুরো করতে পারিনি কিছু মনে করেছেন?'

'কেন পারনি?'

'অনেক সময় অনেক কিছু পাওয়া যায় না'।

আহমদ মুসারা হাঁটছিল ডোনাদের ফ্যামিলি ড্রইং রুমের সামনে দিয়ে।

ডোনার আব্বা ড্রইং রুমে বসে কাগজে নজর বুলাচ্ছিল। আহমদ মুসাদের যেতে দেখে বলল, 'আহমদ মুসা একটু এস'।

আহমদ মুসা ও ডোনা দু'জনেই প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

আহমদ মুসা বসলে ডোনার আব্বা খবরের কাগজের লাল পেন্সিলে মার্ক করা একটা অংশ তাকে দেখিয়ে বলল, 'ছোট্ট বিজ্ঞাপনটা পড়'।

আহমদ মুসা পড়ল। বলল, 'জি, একটা ফার্ম ছোট খাট ভাঙা ও ফুটো হওয়া গাড়ি ক্রয় মুল্য থেকে দশ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে কিনছে'।

'হ্যাঁ, এটাই। খুব লোভনীয় সুযোগ। এ ধরণের গাড়ি শতকরা ৩০ ভাগ ডিসকাউন্ট ছাড়া কেউ নেয় না। এই সুযোগে আমাদের সেদিনের ফুটো হয়ে যাওয়া গাড়িটাকে বিক্রি করে দিতে পারি। আমরা গাড়িটা এখন ব্যবহার করছি না'।

'অন্যের চেয়ে ২০ পারসেন্ট কম ডিসকাউন্টে নিচ্ছে। এটা স্বাভাবিক নয়'।

'অস্বাভাবিক হলে তার কারণ কি হতে পারে?' বলল ডোনার আব্বা।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, 'আপনি আপনার এই গাড়ি ভুয়া নাম্বার ও ভুয়া ঠিকানা দিয়ে সার্ভিস সেন্টারে পাঠিয়ে দিন। তারপর এই পত্রিকায় এই কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তাতে বলুন, গাড়ি আপনি বিক্রি করবেন। পেছনের বডিতে কয়েকটা ফুটো হওয়া ছাড়া নিখুঁত গাড়ি। উপযুক্ত কমিশনে বিক্রি হবে'।

'ঠিক আছে। বিজ্ঞাপন দিলাম। গাড়ি পাঠালাম। কিন্তু ভুয়া নাম্বার ভুয়া ঠিকানা কেন?'

‘এই বাড়ি এবং আপনাদেরকে দৃশ্যপটে না আনার জন্যে’।

‘ঠিক আছে। দু’টি কাজই আজ করাচ্ছি’।

‘ধন্যবাদ’। বলে আহমদ মুসা উঠল।

ডোনাও উঠল।

আহমদ মুসা তার ড্রইং ১৯ রুমের সোফায় বসে পত্রিকার বিজ্ঞাপনটার কথাই ভাবছিল। সে নিশ্চিত যে, বিজ্ঞাপনটা ব্ল্যাক ক্রসই দিয়েছে। এর অর্থ ব্ল্যাক ক্রস মরিয়া হয়ে উঠেছে তাদের বুলেটে বিদ্ধ গাড়িটা খুঁজে পাবার জন্যে। গাড়িটা তারা খুঁজে পেতে চায় ডুপ্লেকে ধরার জন্যে, না ডুপ্লের সাহায্যকারীদের ধরার জন্যে? ডুপ্লে যদি ইতিমধ্যে ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে ডুপ্লেই তাদের প্রধান টার্গেট। আহমদ মুসা নিশ্চিত, ডুপ্লে ধরা পড়েনি। তাদের প্রধান টার্গেট ধরা পড়লে তারা গাড়ি খোঁজার এত গরজ করতো না। আহমদ মুসা যে ডুপ্লেকে উদ্ধার করার ঘটনার সাথে জড়িত আছে, এ কথা ব্ল্যাক ক্রস জানে না। এছাড়া শার্কবে’র জাহাজ, নানতেজ এবং সুরলুরের ঘটনা আহমদ মুসার কাজ, একথাও ব্ল্যাক ক্রস নিশ্চয় জানে না। মুখে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার। মি. ক্লাউডে ঠিকই বলেছেন, ব্ল্যাক ক্রস অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। অন্যকে পরোয়া খুব কম করে, তাই শত্রু সম্পর্কে অনুসন্ধানেও তারা যায় না। আহমদ মুসার ক্ষেত্রেও তারা তাই করেছে।

আহমদ মুসা একটা বই নাড়াচাড়া করছিল আর ভাবছিল এই সব কথা। দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা মাথা তুলে একবার দরজার দিকে চাইল। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডোনার আব্বা ও ডোনা।

‘আসুন’ বলে আহমদ মুসা দরজাটা ঠেলে দরজার পাশে কিছুটা সরে এল।

সবাই এসে বসল সোফায়।

ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনির চোখে-মুখে কিছুটা উত্তেজনার ছাপ।

বসেই বলে উঠল, 'গাড়ি নিয়ে ঘটনা সাংঘাতিক পর্যায়ে যাচ্ছে'।

'এমনটাই ঘটার কথা। দয়া করে বলূন কি ঘটেছে?' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি কি ঘটার কথা বলছ?'

'আমাদের গাড়ির খোঁজ পাবার জন্যে ব্ল্যাক ক্রস একদম হন্যে হয়ে উঠবে'।

'ব্ল্যাক ক্রস?'

'জি। ঘটনা কি ঘটেছে আগে আপনি বলুন, আমি বলছি ঐ ব্যাপার!'

'তোমার কথা মত ক্রেতার ছদ্মবেশে একজনকে পাঠিয়েছিলাম সেই সার্ভিস সেন্টারে। সে লোক গিয়ে গ্যারেজ কর্তৃপক্ষকে গাড়ির কথা বলতেই তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। বলেছেন, মশাই গাড়ি কেনার কথা আর বলবেন না। আমরা মহাবিপদে। একটা পার্টি এসেছিল গাড়ি কিনতে। ওরা গিয়েছিল গাড়ির মালিকের বাড়িতে। ঐ নামের গাড়িওয়ালা সেখানে কেউ থাকে না। ক্রুদ্ধ ক্রেতারা এখন আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। গাড়ির মালিককে আমাদের খোঁজ করে দিতে হবে। এসব শুনে এসেছে আমাদের লোক। এখন আমাদের কি করণীয়?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল ডোনার আব্বা।

'ঐ ক্রেতারা ব্ল্যাক ক্রসের লোক। গাড়ির মালিকের সন্ধানে ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে'।

'বুঝলে কি করে তুমি?'

'সেদিন বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছিলাম। আজ আপনি তথ্য দিলেন, তাতে আরও নিশ্চিন্ত হলাম'।

'যদি তাই হয়, তাহলে গাড়িটা ঐভাবে ওখানে দিয়ে আমরা কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম না?'

'অজ্ঞাতসারে যে বিপদে আমরা জড়িয়ে পড়তাম, পরিকল্পিতভাবে আমরা সে বিপদের মুখোমুখি হয়েছি'।

'অর্থাৎ'।

'ব্ল্যাক ক্রসের হাত ফসকে ডুপ্লে বেরিয়ে যাওয়া, তার ওপর ডুপ্লের বাড়িতে সেদিন ব্ল্যাক ক্রসের তিনজন লোক নিহত হওয়া তাদের শক্তি ও মর্যাদাকেই শুধু আহত করেনি, তাদের গোপনীয়তার যে বৈশিষ্ট্য তাকেও হুমকির সম্মুখীন করেছে। সুতরাং ডুপ্লেকে তারা সন্ধান করবেই। আর ডুপ্লেকে খুঁজে পাওয়ার একটা সহজ পথ হলো আমাদের গাড়িটা খুঁজে বের করা। মানুষ লুকানো যায়, গাড়ি লুকানো যায় না। বুলেটে ফুটো হওয়া গাড়ি হয় আমরা বিক্রি করে দেব, নয়তো সার্ভিস সেন্টারে দেব মেরামতের জন্যে। আমার ধারণা প্যারিসের শুধু নয়, দেশের সবগুলো সার্ভিস সেন্টারে তারা চোখ রাখছে এবং বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে পত্রিকায় দিয়েছে ঐ বিজ্ঞাপন। যাতে বিক্রি করতে চাইলে, তারও সুযোগ যাতে তারা নিতে পারে'।

আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডোনার আব্বার। বলল, 'তুমি তো ঠিকই বলেছ আহমদ মুসা। আমাদের গাড়ি যখন সার্ভিস সেন্টারের লোকরা দেখে, তখন বলল, 'গাড়ি আপনারা বিক্রি করতে চাইলে তাড়াতাড়ি বিক্রি হবে। আমাদের সেন্টারে একটা পক্ষ এসে বলে গেছে পেছনে ফুটো হওয়া এবং এ ধরণের ক্রুটিওয়ালা গাড়ির খবর কিংবা গাড়ির ঠিকানা যেন আমরা তাদের দেই। তারা এ ধরণের গাড়ি কিনতে আগ্রহী'। মধ্যস্থতার কমিশন হিসেবে তারা আগাম একটা ফান্ডও দিয়ে গেছে। সুতরাং তোমার কথা ঠিক যে, আমরা সজ্ঞানে এই পদক্ষেপ না নিলে অজ্ঞাতসারে এবং অপ্রস্তুতভাবে ওদের হাতে গিয়ে পড়তাম। তোমাকে ধন্যবাদ আহমদ মুসা'।

ডোনার মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ। বলল, 'আপনি ভবিষ্যৎকে এতটা নিখুঁতভাবে দেখতে পান কেমন করে? আপনি ভবিষ্যত গণনা জানেন?'

'আল্লাহ ছাড়া ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। ভবিষ্যৎ গণনার মত প্রতারণামূলক কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। আমি যেটা করি সেটা নিছক অনুমান। এই অনুমান সবক্ষেত্রে করা যায় না, সব সময় ঠিকও হয় না। যেমন দেখ, গাড়িকে কেন্দ্র করে এখন কি ঘটতে যাচ্ছে আমি বলতে পারবো না'।

'এখন বল গাড়ি নিয়ে কি করব। গাড়ি কি নিয়ে আসব?' বলল ডোনার আব্বা।

'ব্ল্যাক ক্রস এটাই চাচ্ছে। মালিকের কেউ গাড়ি নিতে গেলে তার পিছু নিয়ে সে মালিকের সন্ধান লাভের চেষ্টা করবে'।

'সর্বনাশ! এসব ঝামেলার চেয়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়াই ভালো'।

'তার দরকার হবে না। আমি যাব'।

শুনেই ডোনার মুখ মলিন হয়ে গেল।

ভ্রু কুচকালো ডোনার আব্বা। বলল, 'তুমি যাবে? কেন? কি দরকার?'

'জনাব, ওমর বায়াকে উদ্ধারের জন্যে আমাকে ব্ল্যাক ক্রসের কাছে পৌছাতে হবে। এ পর্যন্ত ব্ল্যাক ক্রসকে যতবার পেয়েছি, হারিয়ে ফেলেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ পাইনি। আমি ওদের কাছে পৌছাতে চাই'।

'এ কাজে আরও লোকের সাহায্য নেয়া যায় না?' গম্ভীর কন্ঠে বলল ডোনা।

'অভিযানের মত কাজ হলে সাহায্য নেয়া যায়। অনুসন্ধানমুলক কাজে এমন সাহায্য খুব কাজে আসবে না।

'কেন?' প্রশ্ন করল ডোনা।

'ধর, বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যদি কারও সাহায্য নিতে চাই, তাহলে সেই লোককে গাড়ির কাছে পাঠাতে হবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ব্ল্যাক ক্রস আজ যে পরিমাণ হন্যে হয়ে উঠেছে, তাতে সে লোক যতটুকু অগ্রসর হতে পারবে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিপদগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'।

'এ কথা কি আপনার ক্ষেত্রেও সত্য নয়?' ডোনার কন্ঠে ক্ষোভ ও বেদনার একটা উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না আহমদ মুসা। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'কথাটা আমার ক্ষেত্রেও সত্য। কিন্তু মূল দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেন, তাকেই মূল কাজ করতে হয়। তা না হলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বাড়ে'।

ডোনা উত্তরে কিছু বলল না। নিচু করল তার ম্লান মুখটি।

'তোমার তাহলে পরিকল্পনা কি?' বলল ডোনার আব্বা।

'আমি সার্ভিস সেন্টারে যাব। সন্ধান করব ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের'।

‘আমাদের কিছু করার নেই?’

‘আপনারা আমার জন্যে অনেক করেছেন। গাড়িটি ব্ল্যাক ক্রসের কাছে পৌছার আমার একটি সেতুবন্ধ’।

মুখ তুলল ডোনা। তার চোখে-মুখে বেদনা ও ক্ষোভের একটা বিস্ফোরণ। বলল, ‘আমাদের প্রাপ্য বোধ হয় আমাদের দিয়ে দিলেন?’

সংগে সংগে উত্তর এল না আহমদ মুসার কাছ থেকে। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

মুখ তুলেছিল আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে। কিন্তু আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই ডোনার আব্বা বলল, ‘বাবা, এসব ব্যাপারে তোমার কথার উপরে আমাদের কোন কথা চলে না। তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা আমাদের আছে। কিন্তু বাবা, ব্ল্যাক ক্রস তোমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে, এটাই আমাদের চিন্তার বিষয়’।

‘আমার যতটুকু সাধ্য, আমার ব্যাপারে আমি সতর্ক, বাকিটুকু আল্লাহর হাতে। তাঁর চেয়ে বড় নেগাহবান আর কেউ নেই’।

ডোনার আব্বা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। তুমি কখন বেরুচ্ছ?’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘এখনি জনাব’।

ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনি বের হয়ে গেল ঘর থেকে। তার সাথে ডোনাও বেরিয়ে গেল মাথা নিচু করে।

ওরা চলে গেলে আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে নিজেকে সঁপে দিল গভীর বিশ্রামের কোলে।

প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

বেরুবার সময় ডোনাকে না দেখে তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তার ঐ কথায় রাগ করেছে ডোনা। ডোনার কথা ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসার মনে হলো বুকের কোথায় যেন ছোট্ট একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে ডোনা সামনে এসে দাঁড়ালে এ অস্বস্তি আনন্দে রূপান্তরিত হতো।

আহমদ মুসা মনের এ ভাবনাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সামনের পদক্ষেপ দ্রুত করল।

লিফট থেকে নেমেই আহমদ মুসা দেখতে পেল ডোনা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরনে তার সাদা গাউন। মাথা ও গায়ে সাদা ওড়না পেঁচানো।

আহমদ মুসার পায়ের শব্দে তার দিকে ফিরে তাকাল ডোনা। বেদনা মাখা মুখ, সজল চোখ।

'তুমি এখানে?' ম্লান হেসে বলল আহমদ মুসা।

ঠেস দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল ডোনা। দাঁড়াল মুখ নিচু করে। কোন কথা বলল না।

'রাগ করার মত খুব বড় কথা বলেছি বুঝি আমি?'

মুখ তুলল ডোনা। তার সজল চোখ থেকে গড়িয়ে নেমে এল অশ্রু। বলল, 'আমরা অনেক করেছি আপনার জন্যে, আর তো কিছু করার নেই'।

'আমি কি সত্যিই একথা বলতে চেয়েছি?'

ডোনা আহমদ মুসার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'চলূন'।

'কোথায়?'

'অনেক করেছি তো, আরও কিছু করে আসি'।

বলে হাঁটতে শুরু করল ডোনা। তার ডান হাতে গাড়ির চাবি।

আহমদ মুসা ডোনার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমরা যা করেছ, তোমাদের যা প্রাপ্য তাকি এর ধন্যবাদ দিয়ে শোধ করলাম! না শোধ করা যায়?'

'তা জানি না। কিন্তু ঐ ধরণের ধন্যবাদ অনেক ক্ষেত্রে অসহনীয় বেদনার হতে পারে'। চোখ মুছে ডোনা বলল।

'আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি ডোনা'।

কথা বলতে বলতে তারা গাড়ি বারান্দায় এসে পৌছল।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ডোনার গাড়ি।

ডোনা গাড়ির দিকে এগিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, 'আসুন'।

কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। আহমদ মুসা ডোনার মতলব বুঝতে পেরেছে। বলল, 'ডোনা, তুমি তো জান আমি কোথায় যাচ্ছি'।

'অবশ্যই জানি'। গম্ভীর কন্ঠ ডোনার।

'এবং এও জান যে, তোমার কিংবা তোমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কোন গাড়িতে আমি সেখানে যাব না'।

'জানি'।

'জানার পরেও বলছ আমাকে গাড়িতে উঠতে?'

'এ গাড়ি এখন আমার পরিবারের গাড়ি নয়'।

'অর্থাৎ'। বিস্ময়, আহমদ মুসার কন্ঠে।

'আমি গাড়ির নাম্বার পাল্টে দিয়েছি। নতুন ব্লু বুকও আছে'।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'গোয়েন্দা কর্ম তাহলে শুরু করে দিয়েছ ডোনা?'

'শিখছি'। মুখ ভার তখনও কাটেনি ডোনার।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা ডোনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। ডাকল, 'ডোনা'।

ধীর শান্ত কন্ঠ আহমদ মুসার। এ ডাকের মধ্যে একটা আবেগও ছিল।

ডোনা মুখ তুলল। চোখ রাখল আহমদ মুসার চোখে। ডোনার চোখে-মুখে লজ্জার একটা লাল প্রবাহের ঢেউ খেলে গেল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসির একটা ছোট্ট কম্পন। বলল, 'বুঝেছি আপনি কি বলবেন'।

'কি বলব?'

'বলবেন যে, ডোনা ওখানে যাওয়া কি তোমার জন্যে ঠিক?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সত্যি ডোনা গোয়েন্দা কর্মে তুমি অনেক দূর এগিয়েছে'।

'অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে। এটা তো কমনসেন্সের ব্যাপার'। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল ডোনা।

‘কমনসেন্সের ব্যাপার নয়, স্ট্রং কমনসেন্সের ব্যাপার। আর স্ট্রং কমনসেন্সই গোয়েন্দা কর্মের পুঁজি’।

‘ধন্যবাদ। উঠুন গাড়িতে’।

‘ডোনা, পাগলামি করো না। ওখানে তোমার যাওয়া হবে না’।

‘কেন?’ গম্ভীর কন্ঠ ডোনার।

‘এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি না।

‘নিতে হবে না, আমার দায়িত্বে আমি যাব’।

‘দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেই কি তুমি যেতে পার?’

‘কেন পারি না? মেয়ে বলেই কি?’

অভিমান ক্ষুব্ধ একটা আবেগ এল ডোনার কন্ঠ থেকে।

‘ইসলামে মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারে, যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আমি কোন যুদ্ধে যাচ্ছি না। তাছাড়া তুমি শুধু মেয়ে নও, তুমি প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। আমি চাই না তোমাদের পরিবারটা কোন সংকটে পড়ুক’।

‘আমি প্রিন্সেস মারিয়া হতে চাই না। আমি সাধারণ মেয়ে ডোনা’।

‘তার পরেও তুমি প্রিন্সেস মারিয়া। নাম বদলালে তুমি বদলে যাবে না’।

‘আমি তো লড়াইয়ে নামছি না। আমি আপনাকে পৌছে দেব মাত্র’।

‘তারপর কি করবে?’

মারিয়া মুখ নিচু করল, কিছু বলল না।

আহমদ মুসার ঠোঁটে ছোট্ট হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘তারপর তুমি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে এই তো?’

‘কেন, লড়াইয়ে যোগ দিতে পারব না, অপেক্ষা করতেও কি পারবো না?’ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল ডোনার কন্ঠ।

একটা ঢোক গিলল, থেমে গিয়েছিল তার কথা। আবার শুরু করল। বলল, ‘আপনার ওপর আস্থা আছে আমার। কিন্তু তারপরও সব কাজ একা করা, সব কাজে একা যাওয়া ঠিক নয়’। গলাটা স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে বলল ডোনা।

কথা শেষ করেই ডোনা গাড়ির এ দরজাটা খোলা রেখেই গাড়ি ঘুরে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল সে। দুই হাত ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর রেখে তার ওপর কপাল ন্যাস্ত করল।

সেদিকে চেয়ে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। ভাবল সে, বুরবো রাজবংশের মেয়েদের রাজকীয় বৈশিষ্ট্য ঠিকই আছে। যা ভালো মনে করে তা করেই ছাড়বে।

আহমদ মুসা সিটে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আমি একা সব কাজ করি না। তবে একজনের কাজে দু'জনকে শামিল করাও ঠিক মনে করি না ডোনা। প্রকাশ্য শক্তির লড়াইয়ে লোক বেশি হলে সুবিধা। কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে, বিশেষ করে যা লুকোচুরির মধ্যে দিয়ে চলে, লোক বেশি হলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়'।

মুখ তুলল ডোনা। তখনও তার মুখ গম্ভীর। চোখটা অশ্রুতে লেপটানো। বলল, 'আপনি অন্যকে যতটা ভালবাসেন নিজেকে ততটা ভালোবাসেন না'।

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'না ডোনা, নিজেকে খুব বেশি ভালোবাসি বলেই তো আমি এই পথে আসতে পেরেছি'।

'এত জটিল কথা আমি বুঝতে পারি না'।

'আমি মানুষের ভালো চাই, আমি আমার জাতির ভালো চাই, মুক্তি চাই এই জন্যে যে, এই দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ আমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন যার ফলে আমি লাভ করব অসীম পুরষ্কার এবং অনন্ত শান্তি'।

'ওতো পরকালের পুরস্কার ও কল্যাণ, শান্তি ও সুস্থতা ইহকালের জন্যেও চাই'।

'সেটাও আল্লাহ আমাকে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন। দেখ দ্বিজনে কয়েকদিন কি আরামে থাকলাম। আবার দেখ এখানে কি রাজার হালে আছি'।

'শান্তি বুঝি এটুকুরই নাম?'

'শুধু এটুকু নয়, উদাহরণ দিয়েছি মাত্র'। মুখ টিপে হেসে আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ, জবাব আজ দেব না’। থামল ডোনা।

ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল তার গাড়ির। গাড়ি নড়ে উঠল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

‘কোথায় যেতে হবে জান?’

‘আস্থা রাখুন’।

‘ধন্যবাদ’। বলে চোখ বন্ধ করে আহমদ মুসা গা এলিয়ে দিল গাড়ির সিটে। ডোনার শেষ কথাটা তখনও তার কানে ভাসছে। সত্যিই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। ভালো লাগছে ডোনার ওপর নির্ভর করতে। অন্তত কিছু সময় তো নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে।

গাড়ি থেমে যাবার ঝাঁকুনিতে তন্দ্রাবস্থা ভেঙে গেল আহমদ মুসার।

চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। চারদিকে একবার চোখ বুলাল। দেখল, তার লক্ষ্য সার্ভিস সেন্টারটির বিপরীত দিকে যে সুপার মার্কেট তার কার পার্কিং-এ এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। চমৎকার জায়গা। এখান থেকে সার্ভিস সেন্টারের গেট দিয়ে সেন্টারের ভেতরের অনেকখানি দেখা যায়। সার্ভিস স্টোর এবং সুপার মার্কেটের মাঝখানে ক্রস-লেন সার্ভিস সেন্টারের গেটের সামনের রোড দিয়ে যে কোন দিকে চলে যেতে পারে।

চোখ ফিরিয়ে তাকাল ডোনার দিকে। ডোনা দুই হাত ষ্টিয়ারিং হুইলে রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

‘ধন্যবাদ ডোনা, তোমার চমৎকার সিলেকশন’। সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে মুখ কাত করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মুখ গম্ভীর। কোন কথা বলল না।

‘এখন তোমার কি পরিকল্পনা ডোনা?’

‘জানি না’।

আহমদ মুসা মাথা নত করল। বলল, ‘ডোনা, এক ঘন্টার মধ্যেও যদি না ফিরি, তাহলে চলে যাবে’।

অন্ধকারের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ডোনার চোখে-মুখে। বলল, 'এভাবে বলো না। বলো, এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে'। কাঁপছিল ডোনার কন্ঠ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'দোয়া করো ডোনা'।

'ফি আমানিল্লাহ'। বলল ডোনা ষ্টিয়ারিং থেকে মাথা তুলে।

'আলহামদুলিল্লাহ'।

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

৩

আইফেল সার্ভিস সেন্টার।

ম্যানেজারের কক্ষ। ম্যানেজার বসে আছে তার চেয়ারে।

তার সামনে বসে চারজন। চারজনের চেহারাই এমন যে, দেখে মনে হবে এই মাত্র ওরা কাউকে খুন করে এসেছে। ওদের সামনে বসা ম্যানেজারকে চোরের মত অপরাধী মনে হচ্ছিল।

কথা বলছিল ওদের চারজনের মধ্যে থেকে সর্দার গোছের লোকটা। বলছিল, আপনি একটা কথাও সত্য বলছেন না। প্রতারণা করছেন আপনি আমাদের সাথে।

'বিশ্বাস করুন, এই গাড়ির ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, গাড়িটা বিক্রি করবে, এসব আমি কিছুই জানি না। নিছক সার্ভিসিং এর জন্যেই গাড়িটা রেখে গেছে। এই প্রতারণায় আমার কি লাভ?'

'সে হিসেব আমাদের নয়। এখন থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা এ গাড়ির মালিককে চাই। আপনি হয় তাকে ডেকে আনবেন, নয়তো তার সঠিক ঠিকানা আমাদের দেবেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিছু যদি না করেন, তাহলে আমরা কি করব তা আমরাই জানি'।

ম্যানেজারের মুখ ফাঁসির আসামীর মত চুপসে গেল।

এই সময় ম্যানেজারের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আসতে পারি?'

ভীত ম্যানেজারের মুখ এবার বিরক্তিতে ভরে গেল। সামনে বসা চারজনের দিকে একবার সে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুন?'

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করলে ম্যানেজার লোকটি তাকে বসতে বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা বসে বলল, 'মাফ করবেন আপনি নিশ্চয় ম্যানেজার?'

‘জি’। বলল ম্যানেজার।

‘আমি বিদেশী। আপনার সার্ভিস সেন্টারের এই গাড়িটি আমি কিনে নিয়েছি’। বলে আহমদ মুসা সার্ভিস সেন্টারের দেয়া ডোনাদের সেই গাড়িটার সার্ভিস রিসিট ম্যানেজারকে দেখাল।

আহমদ মুসা পরিকল্পনা করেই এসেছে। সে গাড়ির ক্রেতার পরিচয় দেবে। তার কাছে গাড়ি বিক্রি হওয়ার দলিল পত্রও নিয়ে এসেছে। সে নিশ্চিত জানে, ক্রেতা হিসেবে গাড়ির ডেলিভারি চাইলেই বিপদগ্রস্থ ম্যানেজার ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের খবর দেবে অথবা গাড়ি সে নিয়ে যেতে লাগলেই ওঁত পেতে থাকা ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের মুখোমুখি হওয়ার সে সুযোগ পাবে এবং ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের মুখোমুখি হওয়ার সে সুযোগ পাবে এবং ব্ল্যাক ক্রসের ঠিকানা জানা অথবা পারলে তাদের কাছ থেকে ওমর বায়ার অবস্থান সম্পর্কে কথা বের করার একটা পথা সে পাবে।

গাড়ির সার্ভিস-রিসিটের দিকে তাকাতেই চোখ দু’টি ছানাবড়া হয়ে উঠল ম্যানেজারের। সামনের চারজনের দিকে একবার তাকিয়ে সে বলল, ‘গাড়ির মালিককে কোথায় পেলেন?’

‘কেন তার বাড়িতে?’

‘কিন্তু সার্ভিস সেন্টারে দেয়া এবং পত্রিকায় ছাপানো ঠিকানায় তো তার পাত্তা পাওয়া যায়নি’।

বলে ম্যানেজার সামনে বসা চারজনের দিকে চোখ ফিরিয়ে উৎসাহের সাথে বলল, ‘আপনারা যে গাড়ির মালিকের খোঁজ করছেন, সেই গাড়ি ইনি মালিকের কাছ থেকে কিনেছেন বলছেন।’

চারজন লোকই এক সংগে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখের দৃষ্টি এমন যেন আহমদ মুসাকে তারা গিলে খাবে। সেই সর্দার গোছের লোকটি বলল, ‘আমরা গাড়িটা কেনার জন্যে ক’দিন থেকে ঘুরছি। ঠিকানা কোথায় পেলেন তার?’

‘কেন কাগজের বিজ্ঞাপনে!’ বিস্মিত হওয়ার ভান করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল এরা ব্ল্যাক ক্রসের সেই লোক যারা ক'দিন ধরে গাড়ির মালিকের সন্ধানে রয়েছে।

'বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'পরের দিনের কাগজে একই জায়গায় বিজ্ঞাপনের সংশোধনী ছিল। সে সংশোধনীটা আমি না পড়লে আমারও ভুল হতো।'

'দেখুন আমরা খুব ভুগেছি এবং নিজেদের প্রতারিত মনে করছি। আপনার কাছে পরের দিনের সেই সংশোধিত বিজ্ঞাপনটি কি আছে?'

'না, সে বিজ্ঞাপনটি নেই। তবে ঠিকানা চাইলে দিতে পারব। গাড়ি বিক্রির দলিলে তাঁর ঠিকানা আছে। কিন্তু ঠিকানা দিয়ে কি করবেন? আমি তো গাড়ি কিনে ফেলেছি।'

'আমরা তো গাড়ির কেনা-বেচা করি। এ রকম গাড়ি যারা রাখেন, তারা গাড়ি-বিলাসে ভোগেন। তাদের সাথে পরিচয় থাকলে ভবিষ্যতে সুযোগ আমরা পেতে পারি।'

আহমদ মুসা মনে মনে লোকটির বুদ্ধির প্রশংসা করল। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে খাসা একটা যুক্তি বের করেছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বড় সাইজের একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে কাগজের ভাঁজ খুলে লেখার দিকে একবার নজর বুলিয়ে একটা স্লিপ পেপার টেনে তাতে একটা ঠিকানা লিখে ব্ল্যাক ক্রসের সেই লোকটির হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা যে ঠিকানা লিখে দিল, সেটাও আগের ঠিকানার মতই ভুয়া। এই ভুয়া ঠিকানা দেয়াও আহমদ মুসার পরিকল্পনার একটা অংশ। আহমদ মুসার লক্ষ্য হলো, ঠিকানা পেয়ে তারা ছুটবে ঐ ঠিকানার উদ্দেশ্যে। আহমদ মুসা তাদের অনুসরণ করবে। ব্ল্যাক ক্রসের লোকেরা ভুয়া ঠিকানায় গিয়ে ব্যর্থতার দুঃখ নিয়ে সব কিছু রিপোর্ট করার জন্যে অবশ্যই তাদের কোন ঘাঁটিতে ফিরবে। ওদের অনুসরণ করে আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসের একটা ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারবে।

আহমদ মুসার লেখা ঠিকানা হাতে নিয়ে ব্ল্যাক ক্রসের সেই লোকটি বলল, 'ধন্যবাদ, আপনার কি আর একটু সাহায্য পেতে পারি?'

'কি সাহায্য?'

'আপনি আমাদের সাথে চলুন, তাহলে সহজেই আমরা ঠিকানাটা খুঁজে পাব।'

মনে মনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে কি আহমদ মুসাকে ওরা সন্দেহ করছে। মনে করছে কি যে, তাদেরকে ঠিক ঠিকানা দেয়া হয়নি? যাই হোক, ওরা খুব সিরিয়াস। ব্যর্থতার কোন অবকাশ তারা রাখতে চাচ্ছে না। কিন্তু তার যে পরিকল্পনা সে দিক থেকে এ ধরনের সহযোগিতা সে করতে পারে না। তাছাড়া ঠিকানাটি খুঁজে পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। ঠিকানা খুঁজে না পেলে যে সংঘাত বাধবে তাদের সাথে, সেটা আগে বাধাই ভালো।

'এই ঠিকানা বের করার জন্যে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা ঠিকানা তো চাই না, চাই ঠিকানার মানুষকে। সে মানুষকে চিনেন আপনি। সুতরাং আপনি আমাদের সাথে থাকলে সুবিধা হবে।'

আহমদ মুসা তাদের যুক্তির বহর দেখে মনে মনে হাসল। বলল, 'আমি তো প্রথমে তাকে চিনতাম না, না চিনেও তো তাঁকে খুঁজে পেয়েছি।'

'দেখুন, ওসব যুক্তি-টুক্তি আমরা বুঝি না। আমদের সাথে আপনাকে যেতে হবে।'

ওদের মুখে এ ধমকের সুর শুনে আহমদ মুসা বুঝল, ওদের ত্বর সইছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা ঠিকানায় পৌঁছতে চায়। আহমদ মুসাকে কার্যত ওরা পণবন্দী করতে চাচ্ছে। ঠিকানা খুঁজে না পেলে কিংবা ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কাউকে না পেলে আহমদ মুসাকে ধরা হবে ওদের খুঁজে বের করার জন্যে। আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, ওদের হুমকিমূলক কথার উপযুক্ত জবাব দিলে এখনি মারামারি শুরু হয়ে যাবে কিন্তু আহমদ মুসা ওদের সাথে এখনি মারামারি বাধাতে চায় না। ওদের যেমন টার্গেট গাড়ির মালিক অর্থাৎ ডোনাদের ঠিকানা বের করা, তেমনি আহমদ মুসার টার্গেট হলো ব্ল্যাক ক্রসের কোন ঠিকানা খুঁজে পাওয়া।

আহমদ মুসা বলল, 'তাহলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই চলুন।'

বলে আহমদ মুসা ম্যানেজারকে গাড়ি সার্ভিসের পয়সা পরিশোধ করে গাড়ির ডেলিভারি স্লিপ নিয়ে নিল।

ম্যানেয়াজার দারুণ খুশি। বলল, 'যা সংকটে পড়েছিলাম। আপনি আসায় ওদের কাজ হলো এবং আমিও বাঁচলাম।'

'ফিরে এসেও গাড়ি ডেলিভারি নিতে পারতেন। আমদের গাড়িতে সকলের জায়গা হতো।' বলল সেই চারজনের সর্দার গোছের লোকটা।

'কি দরকার এখানে ফেরার।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। ওরা চারজন আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ওরা বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

আহমদ মুসা তার অর্থাৎ ডোনাদের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল।

ওদের চারজনের সেই সর্দার গোছের লোকটা বলল, 'মাফ করবেন। আপনি আমদের গাড়িতে উঠুন। গাড়ির মালিককে না পাওয়া পর্যন্ত এ গাড়ি আপনার নয়।'

ক্রোধে আহমদ মুসার অন্তরটা জ্বলে উঠল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঝগড়া বাধাতে চাইল না সে।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে ওদের গাড়িতে গিয়ে উঠল। পেছনের সিটের এক প্রান্তে এসে বসল সে। তার পেছনে বসল দু'জন। আর দু'জনের একজন ড্রাইভিং সিটে, আরেকজন তার পাশের সিটে।

ওদের মুখ প্রসন্ন। যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছে ওরা।

সর্দার গোছের সেই লোকটি তার আসনে বসতে বসতে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনার গাড়ির মালিক আমাদের খুব ভুগিয়েছে। তাই কোন অনিশ্চয়তার ঝুঁকি আমরা নিতে চাই না।'

আহমদ মুসা ভাবছিল তখন অন্য বিষয়। যা ঘটতে যাচ্ছে, তা ঘটতে দেয়া যায় না। ভুয়া ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছতে দিলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়াবে। ওদের কোন ঘাঁটির ঠিকানা সংগ্রহ তার যে লক্ষ্য সেটা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং আগেই কিছু একটা করতে হবে।

লোকটির কথায় আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল। মুখ তুলল আহমদ মুসা। গাড়ির ইনসাইড লাইট তখনও জ্বলে আছে।

চোখ তুলতে গিয়ে সামনের দুই সিটের মাঝখানের জায়গায় কাগজের মোড়কের ওপর হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ আটকে গেল।

কাগজের বড় ইনভেলাপ। বেশ পেট ফোলা। তার মধ্যে কাপড় কিংবা বই জাতীয় কিছু আছে। কিন্তু সেদিকটা আহমদ মুসার আগ্রহের বিষয় নয়। তার দু'টি চোখ নিবদ্ধ ইনভেলাপটির ওপরের লেখার ওপর। ফরাসী ভাষায় হস্তাক্ষরে লেখা। পড়ল আহমদ মুসা, 'রলফ এইচ ফ্রিকে, ২১১, 'রো আনাতল ডেলা ফর্গ', প্যারিস ১৯।'

পড়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এটা ব্ল্যাক ক্রসের কোন ঠিকানা? কাগজের এই কভারে করে সেখানে কোন কিছু এসেছিল? অথবা ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটি থেকে কেউ এই কভারে করে কোন কিছু ঐ ঠিকানায় পাঠাচ্ছে? কোনটি ঠিক? এই প্রশ্নের সমাধানের একটা উপায় চিন্তা করল আহমদ মুসা।

লোকটির কথার জবাব দিতে সে বলল, 'ধন্যবাদ। ঘটনা যাই হোক। একজন ভদ্রলোকের সাথে ভালো আচরণ করতে পারতেন আপনারা।'

'আমরা খুব খারাপ কিছু করেছি?' বলল সেই সর্দার গোছের সেই লোকটি।

'গাড়ি সম্পর্কে আপনারা অশোভন আচরণ করেছেন। আমি ওদিক দিয়ে 'রো আনাতল ডেলা ফর্গে' যেতে পারতাম। উল্টো আমাকে এখানে আবার ফিরে আসতে হবে।'

কথাটা বলে মনে মনে খুব খুশি হলো আহমদ মুসা। ওদেরকে তাদের ঠিকানা সম্পর্কে কথা বলতেই হবে এবার।

কথা বললও তারা।

আহমদ মুসা কথাটা বলার সাথে সাথে চমকে উঠে সেই সর্দার গোছের লোকটা আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি রো আনাতল ডেলা ফর্গে থাকেন?'

গাড়ি তখন সার্ভিস সেন্টার থেকে বেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল। দ্রুত চলছিল গাড়ি।

‘হ্যাঁ। চেনেন ওদিকটা?’

‘চিনব না কেন? আমরা তো ঐ রোডেই থাকি।’

‘আপনারা সবাই?’ যেন খুশি হয়ে-আহমদ মুসা বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে প্রশ্ন করল।

‘সবাই বলতে পারেন।’

‘ওখানে আপনাদের অফিস, না বাসা?’

‘অফিস। বাসাও আছে।’

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। নিশ্চিত হলো সে, ২১১ রো আনাতল ওদের একটা ঘাঁটির ঠিকানা।

দ্রুত চিন্তা করছিল আহমদ মুসা। ভুয়া ঠিকানাটা নির্মানাধীন একটা সরকারি ভবনের। ওখানে পৌঁছলে তাকেই অসুবিধায় পড়তে হবে। সুতরাং অবিলম্বে এদের আটকাতে হবে এবং তাকে ওদের রো আনাতল-এর ঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে।

গাড়ি তখন ‘লিটল ইল ডেলা সাইট’ নামক বিখ্যাত পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

সেদিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘পার্কে একটু গাড়ি দাঁড় করান, আমাকে একটু টয়লেট করতে হবে।’

সর্দার গোছের লোকটি আহমদ মুসাকে কি যেন বলতে শুরু করেও থেমে গিয়ে ড্রাইভ যে করছিল তার দিকে ফিরে বলল, ‘ঠিক আছে দাঁড় করাও।’

গাড়ি পার্কে প্রবেশ করল।

বিশাল পার্ক। দিনের অফিস চলাকালীন এ সময়ে পার্কে লোক থাকে না বললেই চলে।

পার্কে কিছু পাবলিক টয়লেট আছে। টয়লেটগুলো একটা করে যেন সবুজ দ্বীপ। টয়লেট ঘিরে সবুজ ঝোপ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাঝখানে টয়লেট বিল্ডিং। টয়লেটগুলো আসলে বিশ্রাম কেন্দ্রও।

একটা টয়লেটের মাঝে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো হলো।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে টয়লেটে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা নেমে যেতেই সর্দার গোছের সেই লোকটি অন্যদের বলল, 'তোমরা ভেতরে যাও। সাবধানের মার নেই।'

ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটিসহ ওরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসার পিছু পিছু টয়লেটে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা টয়লেটে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। টয়লেটের বারান্দায় ওদের তিনজনকে উঠে আসতে দেখে আহমদ মুসা দরজার আড়ালে দাঁড়াল।

ওদের চারজনকেই আহমদ মুসা টয়লেটে আশা করছিল। তার হিসেব মেলেনি। সর্দারটাই আসেনি। এর অর্থ তার ওপর সর্দার লোকটির সন্দেহটা খুব পাকাপোক্ত নয়।

ওরা তিনজন হুড়মুড় করে টয়লেটে প্রবেশ করল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে রিভলবার বের করে হাতে নিল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ওরা তিনজনই ঘুরে দাঁড়াল।

উদ্ধত রিভলবার হাতে আহমদ মুসাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল।

আহমদ মুসা বলল, 'তিনটা গুলী ছুঁড়তে এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না। রিভলবারে সাইলেন্সার আছে। আপনারা খুন হলে কেউ জানতে পারবে না।'

বলে আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে পেস্টিং টেপের একটা রোল সামনের লোকটার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি ঐ দু'জনকে পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে ফেল।'

ইতস্তত করছিল লোকটা।

আহমদ মুসা ট্রিগার টিপল রিভলবারের। নিঃশব্দে একটা গুলী লোকটার মাথার হ্যাট উড়িয়ে নিয়ে গেল। বলল আহমদ মুসা, 'দ্বিতীয় গুলী তোমার কপাল ফুটো করে দেবে।'

সংগে সংগেই লোকটা কাজে লেগে গেল। বেঁধে ফেলল দু'জনকে।

পরে আহমদ মুসা অবশিষ্ট লোকটাকে বেঁধে দরজা লক করে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা টয়লেট বুশ থেকে বেরুতে বেরুতে দেখল সেই সর্দার লোকটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে বুশের দিকে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়?'

'কেন টয়লেটে?'

'তিনজন টয়লেটে কি করছে?' তার চোখে-মুখে সন্দেহ।

'যে জন্যে ওরা গেছে টয়...।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করার আগেই সর্দার সেই লোকটা তার পকেটে রাখা হাতটা বের করে আনল। হাতে রিভলবার। আহমদ মুসা কথা শেষ না করেই লোকটার পকেট থেকে বেরিয়ে আসা রিভলবার ধরা হাতটির ওপর এক লাথি ছুঁড়ে মারল।

লোকটা প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে। আচমকা লাথি খেয়ে হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

প্রায় সাড়ে ছয়ফুট লম্বা বিশাল বপু লোকটা আছড়ে পড়ল মাটিতে আহমদ মুসাকে নিয়ে। লোকটা দু'হাতে গলা চেপে ধরেছিল আহমদ মুসার।

দু'পা গুটিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। পড়ে যাবার পর জোড়া দু'টি পা লোকটির কোমরে গেঁথে ছুঁড়ে দিল তার দেহের পেছনের অংশকে।

লোকটার দেহ উল্টে গিয়ে ছিটকে পড়ল আহমদ মুসার মাথার ওপাশে। তার হাতটা নেমে গেল আহমদ মুসার গলা থেকে।

লোকটার দেহ ছুঁড়ে দেবার পর আহমদ মুসা নিজের দেহকে উল্টো মুখে ছুঁড়ে দিল একজন অতি দক্ষ এ্যাক্রোব্যাটের মত।

আহমদ মুসা গিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। লোকটা তখন মাথা তুলছিল। আহমদ মুসা গিয়ে তার ওপর পড়ায় তার মাথাটা আবার নিচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার হাতটা। তার ডান হাতের প্রচণ্ড একটা ঘুষি ছুটে গেল আহমদ মুসার চোয়াল লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা মাথা সরিয়ে এবং বাম হাত দিয়ে ঘুষিটা ঠেকিয়ে ডান হাত দিয়ে পাল্টা ঘুষি চালাল লোকটার কানের পাশের নরম জায়গাটায়।

পাল্টা আক্রমণ এল না লোকটার দিক থেকে। দেখল লোকটা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে টেনে বুশ টয়লেটের ভেতর নিয়ে একটা টয়লেটে ঢুকিয়ে লক করে বেরিয়ে এল।

এসে উঠল গাড়িতে।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি 'রো আনাতল ডেলা ফর্গে'র ব্ল্যাক ক্রসের আস্তানার দিকে।

এলাকাটা অনেক দূর।

বেশ সময় লাগল পৌঁছতে।

২০৯ নাম্বার বাড়ির সামনে একটা কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা হেঁটে এগিয়ে চলল ২১১ নাম্বার বাড়ির দিকে। গাড়ি ২১১ নাম্বারে না নিয়ে যাবার কারণ ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ি থেকে সে নামলে শুরুতেই ওরা তাকে সন্দেহ করে বসবে।

২১১ নাম্বার একটা তিনতলা বাড়ি। এলাকাটা পুরানো প্যারিসের একটা অংশ। দেয়াল ঘেরা বাড়ি। গেট পেরুলেই ছোট্ট সবুজ চত্বর। তারপর উঁচু বারান্দা। বারান্দার পরেই একটা দরজা। দরজা দিয়ে যে ঘরে প্রবেশ করা যায়, সেটা একটা বড় হলঘর বলে মনে হয়। দরজার দু'পাশে দুটি জানালা। জানালা দুটি খোলা। দরজা বন্ধ।

বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ধীরে ধীরে চাপ দিল দরজায়। দরজা বন্ধ।

দরজায় নক করল আহমদ মুসা। হাতে তুলে নিল রিভলবার।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সময় বেশি নেয়া যাবে না। যারা ঘাঁটিতে আছে তাদের কাবু করেই যা জানার জেনে নিতে হবে এবং ঘাঁটিটা একবার খুঁজে দেখতে হবে।

দরজাটা নড়ে উঠল। কেউ দরজা খুলছে। উৎকর্ণ ছিল আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরে কারও পায়ের শব্দ পেল না সে। তাহলে কি আগে থেকেই লোক ছিল।

দরজা খুলে গেল।

শক্ত-সমর্থ দীর্ঘকায় একটা লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা তার বুক বরাবর পিস্তল তুলে ধরল এবং বাম হাত দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

লোকটা নির্বিকারভাবে পিছু হটতে লাগল। অবাক হলো আহমদ মুসা যে, লোকটার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

লোকটাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা চাপা কণ্ঠে বলল, 'উপুড় হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়। এক আদেশ আমি দু'বার করি না।'

লোকটা সংগে সংগেই শুয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে পেস্টিং টেপের রোলটি বের করে এগোলো শুয়ে পড়া লোকটির দিকে।

এই সময় ঘরের দু'প্রান্ত থেকে দু'টি কণ্ঠ হো হো করে হেসে উঠল। বলে উঠল দু'টি কণ্ঠই, 'রিভলবার ফেলে দাও সম্মানিত অতিথি। আমরা এক আদেশ দু'বার করি না।'

রিভলবার হাতে রেখেই আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে দেখল, স্টেনগানধারী দু'জন ঘরের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাদের স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে উদ্যত।

বুঝল আহমদ মুসা, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। এরা আগেই তৈরি ছিল। লোকটির মুখে ভয় ও উদ্বেগ দেখিনি এই কারণেই। কিন্তু এরা জানতে পারল কেমন করে?

আহমদ মুসা রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিল হাত থেকে।

দুই স্টেনগানধারী এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। মেঝেয় শুয়ে পড়া লোকটি উঠে দাঁড়াল। একজন স্টেনগানধারী স্টেনগানের নল দিয়ে আহমদ মুসার ঘাড়ে আঘাত করে হাত থেকে পেস্টিং টেপের রোল কেঁড়ে নিয়ে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ানো লোকটির দিকে তুলে ধরে বলল, 'বেঁধে ফেল শয়তানকে।' বহুত ঘড়েল এক লোক। ওরা আসুক তারপর বিহিত করা যাবে।

এই সময় জানালার দিক থেকে দুপ করে মৃদু একটা শব্দ হল।

আহমদ মুসার বাম পাশের স্টেনগানধারী উল্টে গিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

আহমদ মুসা মুখ ফিরাল জানালার দিকে। সেই সময়ই তার কানে এসে বাঁজল সে 'দুপ' শব্দ আবার। দুর্বোধ্য এক গোঙ্গানি তুলে আহমদ মুসার ডান পাশের লোকটি লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দেখল, দু'হাতে পিস্তল ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে ডোনা।

আহমদ মুসা ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দেখল ডোনার পিস্তল ধরা হাত শক্ত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে চিৎকার করে উঠল ডোনার কণ্ঠ, 'বসে পড় তুমি।'

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা নিজের দেহটাকে ছুঁড়ে দিল মেঝের উপর। দেখল, যে লোকটি তাকে বাঁধতে আসছিল, সে লোকটি মেঝে থেকে রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সেই 'দুপ' শব্দ আবার তার কানে এসে বাজল। ডোনা গুলী করেছে আবার।

লোকটি আর রিভলবার তুলে উঠে দাঁড়াতে পারল না। গুলী তার মাথা গুঁড়ো করে দিয়েছে। যেমনভাবে সে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, তেমনভাবেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির ওপর।

দরজা ঠেলে ডোনা প্রবেশ করল ঘরে। এখনও সে দু'হাতে পিস্তল ধরে আছে। তার দৃষ্টিতে বিহ্বল ভাব। শিথিল পায়ে সে এগিয়ে আসছে। টলছে সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

দ্রুত এগিয়ে সে ধরল ডোনাকে।

ডোনার হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল। সে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসার বাহু শক্ত করে। মাথা রাখল সে আহমদ মুসার কাঁধে।

আহমদ মুসা ডোনার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনা দিল। বলল, 'এই সময় সাহস হারাতে নেই। তুমি তো জিতে গেছ ডোনা।'

অল্পক্ষণ পরে আহমদ মুসা আবার বলল, 'আমরা এখানে বেশি সময় পাব না ডোনা। ওরা এসে পড়বে।'

ডোনা কাঁধ থেকে মাথা তুলল। সরে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখের দিশেহারা ভাব এখনও কাটেনি। বলল, 'আর কি কাজ আছে এখানে?'

'ঘাঁটিটা সার্চ করব। কোন কাগজপত্র, দলল-দস্তাবেজ পাই কিনা। কথা আদায় করার কোন লোক তো অবশিষ্ট থাকল না।'

বলে আহমদ মুসা মেঝে থেকে ডোনার পিস্তলটি তুলে নিয়ে চুমু খেল পিস্তলটায়। তারপর ডোনার হাতে তুলে দিল পিস্তলটা।

ডোনার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রক্তিম ঠোঁটটা নড়ে উঠল কিছু বলার জন্যে। কিন্তু কথা ফুটল না।

আহমদ মুসা তখন চলতে শুরু করেছে ভেতর বাড়ির দিকে। বলল, 'এস ডোনা।'

দশ মিনিট পরে আহমদ মুসা এবং ডোনা বেরিয়ে এল বাইরের সেই হল ঘরটায়।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিস্ময়। বাড়িতে সব আসবাবপত্রই আছে। কিন্তু এক টুকরা কাগজও নেই। টেলিফোন আছে। কিন্তু টেলিফোন সেটে নাম্বার স্লিপ নেই, টেলিফোন গাইডও নেই। নানতেজের ঘাঁটিতেও আহমদ মুসা এটাই দেখেছে, মনে পড়ল আহমদ মুসার। অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্রস তাদের ঘাঁটিতে এমন কিছুই রাখে না বা থাকে না যা দেখে এদের কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে। এদের কোন ব্যক্তিও তা অন্য সহযোগী কিংবা অন্য কোন ঘাঁটি সম্পর্কে কিছু জানে না, জানতে দেয়া হয়না। অদ্ভুত সিকিউরিটি ব্যবস্থা এদের। মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না আহমদ মুসা।

হলঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা থেকে চত্বরে নামতে নামতে আহমদ মুসা বলল, 'অদ্ভুত সংগঠন এই ব্ল্যাক ক্রস। ঢুকতেই পারছি না ওদের ভেতরে, যে পথ ধরছি, সে পথই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

নরম সহানুভূতি তার চোখে-মুখে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

গেটের বাইরেই দাঁড় করানো ছিল ডোনার গাড়ি।

গাড়িতে উঠে বসল দু'জন। ডোনা আগেই ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে গিয়ে বসল। আহমদ মুসা বসল ড্রাইভিং সিটে।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

'দেখবেন, পার্কের বুশ টয়লেটে ওদের পাওয়া যায় কিনা?' বলল ডোনা।

আহমদ মুসা ডোনার 'তুমি' পর্যায় থেকে 'আপনি' পর্যায়ে উঠে আসা লক্ষ্য করল। ঈষৎ হেসে তাকাল ডোনার দিকে।

অল্প পরে বলল, 'লাভ হবে না। ওরাই ঘাঁটিতে খবর পাঠিয়ে এদের সাবধান করেছিল। সুতরাং ওরা এতক্ষণে মুক্ত হয়েছে বা মুক্ত করা হয়েছে।'

থামল আহমদ মুসা। একটু পরে আবার শুরু করল, 'তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ ডোনা। তুমি আমাকে ফলো করবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

'রাগ করেছ তুমি? আমি চুপ করে থাকতে পারিনি।' অপার্থিব এক আবেগে উপচে পড়ছে ডোনার চোখ-মুখ থেকে।

ডোনার এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'তুমি এত সুন্দর পিস্তল চালাতে পার, ভাবতেও আমার অবাক লাগছে?'

'ঠিক নয়, আমি ভালো পিস্তল চালাতে পারি না। আজ কি ঘটেছে বলতে পারবো না। মনে হয় সজ্ঞানে আমি কিছু করিনি।'

'তাহলে প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন জেগে উঠেছিল। হাজার হলেও বুরবো রাজকুমারী। তার নিশানা অব্যর্থ না হয়ে পারে না।' আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি।

'বুরবো রাজকুমারী হলে অমন ভেঙে পড়তো না। আপনাকে অবলম্বন না পেলে আমি সংজ্ঞা রাখতে পারতাম না।'

ডোনার ‘আপনি’ ও ‘তুমি’ আবার লক্ষ্য করে হাসল আহমদ মুসা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, ‘অবলম্বন ছিল বলেই ভেঙে পড়েছিলে। না থাকলে প্রতিরোধ শক্তি আরও বৃদ্ধি পেত।’

‘হবে হয়তো। আমি বুঝি না।’

বলে ডোনা একটু হাসল। তারপর গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিয়ে দু’চোখ বন্ধ করে বলল, ‘আপনি মারিয়া জোসেফাইনকে বেশি কৃতিত্ব দিতে চান। মারিয়া জোসেফাইনের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব আছে।’

‘আর তুমি মারিয়া জোসেফাইনকে আড়ালে রাখতে চাও।’

‘কারণ আপনার পরিচয় ডোনা জোসেফাইনের সাথে।’

‘আমার পরিচয়ের ডোনা জোসেফাইন আজ আবির্ভূত হয়েছে মারিয়া জোসেফাইন রূপে।’

‘এখানেই আপত্তি।’

‘তোমার কাছে যা অপত্তির, আমার কাছে তা অলংকার।’

‘অলংকার?’ চোখ খুলল ডোনা।

‘হ্যাঁ। বুরবো রাজ-ঐতিহ্য ডোনা জোসেফাইনকে মনোহর সৌকর্য ও সম্মানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে।’

ডোনা ধীরে ধীরে বলল, ‘আপনি এমন কথা আগেও বলেছেন। কিন্তু আমার ভয় করে। বুরবোদের কাল পাপ না আবার ডোনাকে ঢেকে দেয়। ইসলামকে যতদূর বুঝেছি তাতে শিরকের পরেই ইসলাম সবচেয়ে ঘৃণা করে অবিচারকে।’

‘ভয় তোমার অমূলক ডোনা। বুরবোদের নীল-রক্তের তুমি উত্তরাধিকারী, তাদের কাল-কর্মের উত্তরাধিকার তোমার নেই। দেখ জাগতের শেষ নবী আমাদের রসূল মুহাম্মদ স। পৌত্তলিক কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৌত্তলিকতাকে তিনি উচ্ছেদ করেন, কিন্তু কোরাইশ বংশধারাকে তিনি সম্মান করতেন, এজন্য গর্বও করতেন।’

থামল আহমদ মুসা। ডোনা জবাব দিল না। অনেক্ষণ কথা বলল না। অবশেষে মুখ খুলল। বলল, ‘ধন্যবাদ। ডোনা আর মারিয়া হতে আপত্তি করবে না।’ ডোনার কণ্ঠ আবেগে কাঁপল।

বলেই ডোনা পকেট থেকে একটা লাল গোলাপ বের করে দু’হাতে আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘মারিয়ার এই অভিষেক মুহূর্তে তার পক্ষ থেকে তোমাকে দেবার মতো এছাড়া আর কিছুই নেই।’

ফুলটি হাত পেতে নিল আহমদ মুসা। একদম তাজা গোলাপ। একবার গন্ধ নিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘মনে হচ্ছে সদ্য তোলা। কোথায় পেলে এই তাজা গোলাপ?’

‘পার্কে তুমি যখন বুশ টয়লেট থেকে বেরিয়ে শেষ লোকটিকেও কুপোকাৎ করলে, তখনই এ গোলাপ আমি তুলেছিলাম। আমি তখন বসেছিলাম একটা গোলাপ ঝাড়ের আড়ালে।’

এ প্রসংগে আহমদ মুসা আর কিছু বলল না। মুহূর্ত কয়েক চুপ থাকার পর বলল, ‘একটা কথা বলি ডোনা?’

‘আপনি’ এবং ‘তুমি’-এর দ্বন্দ্ব তোমার কবে কাটবে?’ মুখে হাসি আহমদ মুসার।

ডোনা মাথা নিচু করল। উত্তর দিল না।

অল্পক্ষণ পরে বলল, ‘পারছি না।’

‘কেন?’

‘হৃদয়ের চাওয়া এবং বিবেকের দণ্ড তো পাশাপাশি থাকে।’

‘হৃদয়ের চাওয়া যদি বিবেকের রায়সম্মত হয়, তাহলে বিবেক দণ্ড উচায় না।’

‘কিন্তু এই চাওয়া এবং এই রায়ের মাঝে সংঘাত আছে। হৃদয়ের চাওয়া কোন শর্ত বিচার করে না, কিন্তু বিবেক তো বাস্তবতা, সম্ভাব্যতা ও ন্যায্যতা সবই পরখ করে দেখে। হৃদয় আকাশের চাঁদ চাইতে পারে, কিন্তু বিবেকের কাছে এটা হাস্যকর।’

মুখ নিচু রেখেই কথা বলছিল ডোনা। তার কন্ঠ ভারী। যেন অশ্রুর কোন সরোবর থেকে তা উঠে আসছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু বলা হল না। সামনে রাস্তায় পুলিশ দেখে ওদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

সামনেই রাস্তার ডান পাশে প্যারিসের বিখ্যাত লুক্সেমবার্গ প্রাসাদ। সে প্রাসাদের সামনেই পুলিশের বিরাট সমারোহ। বিস্মিত দৃষ্টি সেদিকে ঘুরিয়ে সামনে রাস্তার পাশে চাইতে আহমদ মুসা দেখল রাস্তার ফুটপাত কার পার্কিং জুড়ে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তাদের প্ল্যাকার্ড। সব মেয়ের মাথায় ওড়না। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল এরা মুসলিম মেয়ে। ভাল করে দৃষ্টি দিল ওদের প্ল্যাকার্ডের দিকে। প্রথমেই দৃষ্টি দিল যে প্ল্যাকার্ডের দিকে তাতে লেখাঃ 'ধর্মীয় ঐতিহ্যিক অধিকার জাতসঙ্ঘ সনদও নিশ্চিত করেছে।' অন্য একটিতে লেখাঃ 'মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার ফরাসী সরকার পদদলিত করেছে।' অপর একটিতে আহমদ মুসা পড়ল, 'মুসলিম মেয়েদের ওড়না কেড়ে নেয়া মানে তাদের নিশ্বাসকে হত্যা করা।'

ডোনা দ্রুত উচ্চকণ্ঠে বলল, 'ওহো, লুক্সেমবার্গ প্রাসাদে আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক বসেছে। মুসলিম মেয়েরা এসেছে ফরাসী সরকার কর্তৃক তাদের অধিকার দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।'

'ইউরোপীয় হিউম্যান রাইটস কমিশন কি ফ্রান্সে বসে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টু'শব্দ করবে?' বলল আহমদ মুসা।

'ফ্রান্সে বসে কেন, অন্য কোন জায়গায় বসেও করবে না। আসলে একে ওরা মানবাধিকার লঙ্ঘন মনেই করছে না।' বলল ডোনা।

'অধিকারটা মুসলমানদের বলেই কি?'

'ওটা একটা কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ হল ধর্মীয় মূল্যবোধ, শালীনতা, এমনকি সাধারন নৈতিকতা সম্পর্কেও ওরা কোন জ্ঞান রাখে না। ওদের বড় বড় ডিগ্রি, সুন্দর সুন্দর পোশাক নিয়ে আর পালিশ করা পরিবেশের মধ্যে মানুষ রূপী যাদের ঘুরে বেড়াতে দেখছেন তারা বলতে পারেন পশু। ফরাসী বিপ্লবের পর এডমন্ড বার্ক কি বলেছিলেন আপনার মনে আছে?'

‘কি বলেছিলেন?’

‘তথাকথিত উদার নৈতিকতাবাদীরা যুক্তি ও বাস্তববাদের দোহাই দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যখন ধর্মকে ছেঁটে ফেলল, তখন বার্ক বলেছিলেন, ‘যুক্তি মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তবে যুক্তিবাদের শক্তি যত বেশিই হোক না কেন, এটা সীমাহীন নয়।মানুষের জানা দরকার, এ অনন্ত বিশ্বে শান্ত প্রানী হিসেবে তার সবটা সে কখনও জানতে পারবে না। সব জেনে ফেলার দাবী যুক্তিবাদী মানুষের ক্ষমতার বিপজ্জনক অতিরঞ্জন। যুক্তিবাদ হল কাহিনীর অর্ধাংশ মাত্র। মানুষ্কে তার নিজের ওপর ছেড়ে দিলে অদৃশ্য প্রবৃত্তির বলে জীবন তার দুঃখময় হয়ে উঠবে এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে নিজেকে ও অন্যদেরকে ধ্বংস করবে। মানুষকে তার নিজের প্রবৃত্তির উপর ছেড়ে দিলে সে পশুরও অধম হয়ে পড়বে।’ থামল ডোনা।

‘বার্কের সে বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশের কয়েকটা কথা বাদ রাখলে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি সেটা?’

বার্ক আরও বলেছিলেন, ‘সভ্যতা নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ারই ফল। সামাজিক ঐতিহ্য হল ব্যক্তি প্রকৃতিকে নিজস্ব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার শক্তি। এটা সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তি।’

‘ধন্যবাদ, দেখুন, বার্ক কথিত সেই যুক্তিবাদীরাই ক্ষমতার বিপজ্জনক অতিরঞ্জন। আজ তাদেরকে এবং সমাজকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। যা সভ্যতার অগ্রগতি রূদ্ধ করে একে দ্রুত অধঃগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।’

‘তোমাদের বার্কের বক্তব্য কোথাও কোথাও আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষার প্রতিধ্বনি, আবার কোথাও তিনি ভুল করেছিলেন।’

‘যেমন?’

‘সপ্তম শতকের প্রথম শতকে নাযিল হওয়া আল কুরআনের ৯৫ নম্বর সূরা আত-ত্বীনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন যে, ‘মানুষ মহত্তম সৃষ্টি। কিন্তু সে যখন বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করে তার সুস্থ যোগ্যতা ও প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, তখন তাঁকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়।’ আল-কুরআনের এই

কথার কিছুটা প্রতিধ্বনি মেলে সপ্তদশ শতকের শেষে বলা বার্কের ‘পশুতত্ত্ব’-এর মধ্যে। কিন্তু বার্ক ভুল করেছেন যখন তিনি যুক্তি ও ধর্মকে পৃথক ভেবেছেন এবং এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় বা সহাবস্থান চেয়েছেন। ইসলাম বলে, যুক্তিই হল ধর্ম। ধর্মহীনতা হল যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।’

‘আপনার শেষ কথাটা খুব ভারী।’

‘আসলে ভারী নয়। কুরআনের তফসীর পড়েছ তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে।’

‘তবে একটা কথা, যুক্তিই ধর্ম একথা বোধ হয় সব ধর্মের ক্ষেত্রে খাটে না। যেমন খৃস্টান ধর্ম। যুক্তির বিরুদ্ধেই খৃস্টান ধর্মের লড়াই। দশম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ৩৫ হাজার বিজ্ঞানীকে খৃস্টান চার্চ পুড়িয়ে মেরেছে।’

‘অথচ দেখ ইসলাম বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়েছে। যে ধর্ম যুক্তি, বিবেক এবং সত্যিকার বিজ্ঞান চিন্তাকে ভয় করে সে ধর্ম ধর্ম নয় অথবা সে ধর্ম তার সঠিক অবস্থানে নেই।’

গাড়ি এসে গিয়েছিল মেয়েদের কাছাকাছি।

মেয়েদের বিক্ষোভ অবস্থানের পাশেই কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করাতে অনুরোধ করে ডোনা বলল, ‘আমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে। একটু দেখি।’

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, ‘ওদের সাথে যোগ দেবে নাকি?’

‘কেন আমার মাথায় ওড়না আছে, এ দাবি নিয়ে আন্দোলন আমিও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি, তাহলে যোগ দিতে পারবো না কেন?’

কথা শেষ করেই ডোনা তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া দু’টি গাড়ির দিকে তাকিয়েই দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘কিছু একটা অঘটন ঘটবে।’

‘কেন বলছ?’ দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘দু’টি গাড়িতে করে স্কিন হেডেডদের যেতে দেখলাম। ওদের উপস্থিতি বিনা কারণে ঘটে না। যেখানে ওরা যায়, সেখানে একটা কিছু ঘটে।’

‘ওরা কারা?’

‘কিছু কিছু দেশে ওদের পরিচয় ওরা আল্ট্রা ন্যাশনালিস্ট।’

‘ওদের সাম্প্রতিক আরেকটা পরিচয়, ওরা ব্ল্যাক ক্রসের সহযোগী। আব্বা এটা বলেছেন। ওরা অ্যান্টি সেমেটিক ব্ল্যাক ক্রসের প্রভাবে এখন অ্যান্টি ইসলামও হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

কথা শেষ করেই ডোনা ভয় ও বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল, ‘দেখলেন ওরা আর্কাইভসে ঢুকল।’

‘আর্কাইভসে ঢুকল কেন?’

মেয়েদের পেছনেই আর্কাইভস বিল্ডিং। বিশাল আর্কাইভস বিল্ডিং। মেয়েরা আর্কাইভস বিল্ডিং-এর গোড়া বরাবর দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা ডোনার উত্তরে কিছু বলল না। চিন্তা করছিল সে।

ডোনা গাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু এগিয়ে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিল। পোশাকে-আশাকে এবং বয়সেও সে মেয়েদের সাথে মিশে গিয়েছিল।

ঠিক এই সময়েই মেয়েদের অবস্থানের লম্বা সারির মাঝখানে চিৎকার, হৈ চৈ ও হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। কিছু মেয়ে ছুটে ওদিকে চলে গেল, কিচু এল এদিকে, মাঝখান ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু মেয়ে ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর কাতরাচ্ছিল।

প্রাথমিক আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির পর কয়েকজন মেয়ে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে গেল।

ডোনা ছুটে এসেছিল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা তাকে তুলে নিয়ে আহত মেয়েদের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল। নামল গাড়ি থেকে আহমদ মুসা ও ডোনা দু’জনেই।

বেশ কয়েকজন মেয়ে পুড়ে গেল পুড়ে গেল বলে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। কিন্তু পোড়ার কোন চিহ্ন নেই। পুড়বেই বা কিসে। কিছুই তো ঘটে নি। হাঁটু থেকে নিচের দিকেই যন্ত্রণা বেশি।

আহমদ মুসা ঝুঁকে পড়ে কয়েকজনকে পরীক্ষা করল। তারপর ছুটে গেল ঘটনার জায়গায়। কিন্তু সেখানে কিছুই নেই।

ফিরে এল আহমদ মুসা।

‘কিছু বুঝলেন?’

‘কিছু।’

বলে আহমদ মুসা ছুটাছুটিরত নেত্রী গোছের একটি মেয়েকে ডেকে ববলল, ‘আমার মনে হচ্ছে এরা হিট ক্যাপসুলের আঘাতে আহত হয়েছে। এদের তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে নেয়া দরকার।’

আহমদ মুসাদের ছাড়াও আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল।

‘হিট ক্যাপসুল কি?’ সে মেয়েটি বলল।

‘বলছি, এদের আগে ব্যবস্থা করুন।’

‘আমার গাড়ি আছে, আর ওই গাড়িটা হলেই হয়ে যায়।’ বলল ডোনা।

‘ওটা আমাদের গাড়ি। অন্য গাড়িগুলো আধ ঘন্টা পরে আসার কথা।’ সেই মেয়েটি বলল।

কথা শেষ করেই সে নির্দেশ দিল আহত মেয়েদের গাড়িতে তোলার জন্য এবং বলল,’আমি এদের সাথে ক্লিনিকে যাচ্ছি তোমরা মিছিল নিয়ে চলে এস।’

দুই গাড়িতে সাতজন মেয়েকে তোলা হলো।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং-এ বসল। পাশের সিটে ডোনার পাশে বসল সেই নেত্রী গোছের মেয়েটি। পেছনের ছয়টি সিটে ৪ জন আহত মেয়েসহ আরেকজন মেয়ে উঠেছে।

ডোনার গাড়ি ৬ দরজার বিশাল এক বিলাশবহুল কার।

ইতোমধ্যে পুলিশ এসে গিয়েছিল। তারা জানতে চাইল কোন ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহতদের। আরও বলল, আহতদের জবানবন্দী নিতে হবে।

সেই নেত্রী গোছের মেয়েটি ক্লিনিকের নাম জানিয়ে বলল,’কিসের জবানবন্দী নিতে হবে তাদের?’

‘পুলিশকে নিশ্চিত হতে হবে তারা অস্ত্র বহন করছিল না।’

‘ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর। দুর্বল মারও খাবে আসামীও হতে হবে তাদের।’

বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটি।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

ডোনাই প্রথম কথা বলল।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল,’আপনার নাম কি?’

‘ফাতমা।’

‘কোথায় পড়েন?’

‘লুই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে।’

একটু থেমেই মেয়েটি প্রশ্ন করল,’আপনার নাম?’

‘মারিয়া জোসেফাইন।’

‘আপনি মুসলমান নন? আপনাকে আমি মুসলমান মনে করেছিলাম।’

‘কেন মারিয়া জোসেফাইন মুসলমান হতে পারে না?’

‘পারে, কিন্তু সাধারণত ফ্রান্সের মুসলমানরা তাদের নামের সাথে অন্তত একটা আরবী নাম যুক্ত করে। তাই বলছিলাম। তাছাড়া...।’

‘তাছাড়া কি?’

মেয়েটি মানে ফাতমা ডোনার দিকে ভালো করে চেয়ে বলল,’আপনাকে কোথাও দেখেছি, নামটাও আমার পরিচিত।’

‘আমাকে দেখেছেন? কোথায়?’

ফাতমা চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছিল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল,’পেয়েছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে দেখেছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স¤্রাট অষ্টাদশ লুই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে রুইদের সচিত্র বংশ তালিকা আছে। এ বংশ ধারার লেটেস্ট ইনফরমেশনও এর সাথে যুক্ত থাকে। আমি ইতিহাসের ছাত্রী তো, তাই এসব ঘাটাঘাটি করি। দু’দিন আগেও আমি দেখেছি, এ বংশের শেষ নামটি লেখা প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। তার ফটো যুক্ত আছে। যার সাথে আপনার হুবহু মিল।’

‘চেহারার মিল তো থাকে।’

‘নাম ও চেহারার মিল এক সাথে এভাবে হয় না। সত্যি বলুন আপনি কে? তাছাড়া এ ধরনের গাড়িও ফ্রান্সে বিশেষ ভিআইপি’রা ছাড়া ব্যবহার করে না।’

ডোনা উত্তর দিল না। সে কিছুটা বিব্রত।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। বলল,'আপনার সন্দেহ ঠিক। উনি মারিয়া জোসেফাইন লুই। কিন্তু নিজের রাজকীয় পরিচয় উনি চান না। তাই ওর ডাক নাম হয়েছে ডোনা জোসেফাইন।'

আহমদ মুসার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফাতমার চোখ-মুখে একটা বিস্ময় ও বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠল। সে ডোনার কাছ থেকে একটু সরে বসতে চেষ্টা করে ছোট্ট একটা বাউ করল এবং ডোনাকে বলল,'মাফ করবেন। চিনতে না পেরে আপনার সাথে অন্য রকম ব্যবহার করেছি।'

ডোনা দু'হাতে ফাতমাকে জড়িয়ে ধরে বলল,'লুই বংশে জন্মগ্রহণ করা কি আমার অপরাধ যে আমার কাছ থেকে সরে বসতে হবে, আমাকে দূরে রাখতে হবে।'

ফাতমার মুখের বিস্ময়-বিমূঢ়তা তখন কাটেনি। বলল,'মাফ করবেন। আমি বুঝতে পারছি না আপনার মাথায় ওড়না কেন? ফ্রান্স কেন ইউরোপের কোন অমুসলমান মেয়ে এই স্টাইলে ওড়না ব্যবহার করে না।'

'হতে পারে তারা এবং আমি এক নই।' ফাতমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসতে বসতে ডোনা বলল।

এই সময় আহমদ মুসা পেছনে আহত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল,'ক্লিনিক কতদূর?'

'আরও দশ মিনিট লাগবে।'

'ক্লিনিকটা আপনাদের পরিচিত বোধ হয়?'

'আমার আব্বা একজন পার্টনার। ভাইয়াও সেখানে ডাক্তার।'

কথা শেস করে পরক্ষণেই মেয়েটি আবার বলল,'আপনি হিট ক্যাপসুল সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন।'

'হিট ক্যাপসুল নতুন আবিষ্কার। ক্যাপসুলগুলো বাতাসের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে ক্যাপসুলের মোড়ক গলে যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে প্রচন্ড হিটওয়েভ। সে হিটওয়েভ আগুন সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের চামড়া ও গোশতের ওপর অসম্ভব ক্রিয়াশীল। চামড়ায় ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু চামড়ার

ভেতরের সেলগুলোকে পুড়িয়ে শেস করে দেয়। যথাসম্ভব ভালো চিকিৎসা না হলে মানুষ পঙ্গু কিংবা জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।’

ভয় ফুটে উঠল ফাতমার চোকে-মুখে। বলল,’বুঝতে পারছি না এটা ঘটল কি করে?’

ক্যাপসুলগুলো নিক্ষিপ্ত হয়েছে আরকাইভস বিল্ডিং-এর নিচতলার এক কক্ষ থেকে। এক প্রকার বিশেস বন্দুকে ক্যাপসুলগুলো ভরে ট্রিগার টিপে তা ছুঁড়ে দেয়া যায়। জল রংয়ের ক্যাপসুল মাটির কাছাকাছি দিয়ে বাতাসে ভেসে আসে। মিছিল ও বিক্ষোভকারীদের শায়েস্তা করার জন্যেই বিশেষভাবে এ অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে তাদের শায়েস্তাও করা হয়, আবার তাদের পাকড়াও করা যায় এই অভিযোগে যে তারা কোন অস্ত্র বহন করছিল যার বিস্ফোরণ ঘটে ঐ দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে।’

‘সাংঘাতিক অস্ত্র তো।’

কিন্তু ফাতমার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে সে বলল,’আপনি আর্মস এক্সপার্ট না ডাক্তার?’

‘দুটোর কোনটাই নই।’ ঠোঁটে হাসি টেনে উত্তর দিল আহমদ মুসা।

নারী কণ্ঠের একটা ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকার ভেসে এল এ সময় রাস্তার বাম পাম থেকে।

আহমদ মুসা ওদিকে চোক ফিরিয়ে দেখল, একজন মেয়েকে দু’জন লোক জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা গাড়ির মাথা ঘুরিযে সেই গাড়িটার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল।

লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা ওদের কাছে যেতেই একজন মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল,’এশিয়ান ভূত ভাগ, না হলে মাথা গুঁড়ো করে দেব।’

‘ছেড়ে দাও মেয়েটাকে। কি ঘটেছে শুনতেদাও আমাদের।’

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই লোকটা এক ধাপ এগিয়ে এসে ঘুষি চালাল আহমদ মুসার চোয়াল লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা একটু নিচু হয়ে তার ঘুষি পাশ কাটিয়ে তার কোমরের বেল্ট ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে মাথায় তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় লোকটি তার সাথীর এই অবস্থা দেখে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে পিস্তল বের করেছিল। আহমদ মুসার দিকে পিস্তল বাগিয়ে সে বলল,'বিদেশী শয়তান এই মুহূর্তে ভাগ। না হলে মাথা ফু...।'

তার কথা শেষ হলো না।

মুহূর্তে আহমদ মুসার মাথা নিচে চলে গেল। তাঁর ডান পা ছুটে গেল লোকটার পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্যে। তার হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়ে গেল।

বিমূঢ় লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

লোকটাও ছুটে এল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসা বাম হাতটা লাঠির মত সোজা করে তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে তার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মারল প্রতম লোকটার ওপর। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসছিল আহমদ মুসার দিকে। দু'জনেই আছড়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্য করে বলল,'উঠতে চেষ্টা করো না। কুকুরের মত গুলী খেয়ে মরবে।'

আক্রান্ত মেয়েটি আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

'আপনি ওদের চেনেন বোন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা মেয়েটিকে।

'না।' বলর মেয়েটি।

'কেন আপনাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল?'

'কাফেতে চা খেতে খেতে ওদের সাথে দেখা। ওরা আজ রাতে আমাকে ডিনার অফার করেছিল। আমি রাজি হইনি। তারপর ওরা আমাকে তাদের সাথে যেতে বলেছিল। আমি যেতে চাইনি। তাই আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

একটু থামল মেয়েটি।

তারপর মেয়েটি বলল,'আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

পুলিশ এল এ সময়।

আহমদ মুসা সব ঘটনা পুলিশকে জানিয়ে বলল, 'আপনারা দেখুন ব্যাপারটা।'

বলে আহমদ মুসা চলে আসছিল।

পুলিশ হাতকড়া পরাচ্ছিল দু'জন দুর্বৃত্তকে।

'দেখুন আমি শান্তিতে থাকতে চাই, কোন মামলায় জড়াতে চাই না। আমার নিরাপত্তাহীনতা তাতে আরও বাড়বে।' ভয়ার্ত কন্ঠে বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা দাঁড়াল।

একজন পুলিশ মেয়েটির কাছে এসে বলল, 'আপনার ঠিকানা আমাদের দিয়ে চলে যান। আপনাকে বেশি কিছুতে না জড়াতে আমরা চেষ্টা করব।'

আহমদ মুসা চলে এল।

ডোনা, ফাতমা ও পেছনের মেয়েটি সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফাতমা ও অন্য মেয়েটির চোখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

'দুঃখিত, কয়েক মিনিট দেরি হলো।' ফাতমার দিকে চেয়ে কথা কয়টি বলে তাড়াতাড়ি এসে বসল ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা।

ডোনা, ফাতমারাও উঠল গাড়িতে।

গাড়িতে উঠে বসেই ফাতমা বলল, 'আমার মনে হয়ে দেরিতে হয়তো কিছু ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক বড়।'

একটু থেমেই ফাতমা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আবার বলা শুরু করল, 'আপনি আমাদের অবাক করেছেন, যা দেখলাম এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সিনেমার একটা দৃশ্য দেখলাম। রিভলবারওয়ালা দু'জন গুন্ডাকে আপনি একদম পুতুলে পরিণত করলেন, আশ্চর্য!'

ফাতমার চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। মন তার তোলপাড় করছে শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও কোমল চেহারার এই লোকটি

৭৭

অমন ইস্পাতের মত কঠিন আর আগুনের মত অমন জ্বলে উঠতে পারল কেমন করে?

ডোনার ঠোঁটে হাসি। কিছু বলল না সে।

সেদিকে চেয়ে ফাতমা বলল, 'বারে, আপনি হাসছেন, যেন কিছুই হয়নি।'

'ও কিছু না। আসুন আমরা খারাপ অতীতকে ভুলে যাই।' বলে আহমদ মুসা পেছনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বোনেরা কেমন আছেন?'

'যন্ত্রণা আগের চেয়ে বাড়েনি।' বলল পেছনের মেয়েটি।

'আলহামদুলিল্লাহ, বেদনা না বাড়াটা খুবই ভালো লক্ষণ। পোড়া আরও গভীর না হওয়ারই লক্ষণ এটা।'

ফাতমা বুঝল, তার জিজ্ঞাসাকে মারিয়া এবং আহমদ মুসা দু'জনেই এড়িয়ে গেল। সুতরাং ফাতমা এ বিষয়ে আর কোন কথা বলল না। কিন্তু মনের আকুলি-বিকুলি কমল না। বরং যখন জানল আহমদ মুসা মুসলমান, তখন হৃদয়ে যেমন একটা গর্বের ভাব সৃষ্টি হলো, তেমনি মনে জিজ্ঞাসাও বেড়ে গেল। কিন্তু কিছুই বলল না। তার দৃষ্টি রইল সামনে নিবদ্ধ।

ডোনা ফাতমার অস্বস্তিটা বুঝতে পারছে। কিন্তু সে ভাবছে জিজ্ঞাসাটা আরও বাড়ুক। এক সময় বলা যাবে সব কথা। ডোনারও দৃষ্টি সামনে।

আহমদ মুসার দুই হাত স্টিয়ারিং হুইলে। দৃষ্টি তার রাস্তার ওপর নিবদ্ধ।

তারও মনে চিন্তার তোলপাড়।

ফ্রান্সের মুসলিম মেয়েরা রাস্তায় নেমেছে তাদের বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের জন্যে।

তাদের এই শান্তিপূর্ণ চাওয়ার জবাব তারা পেল 'হিট ক্যাপসূল' এর আঘাতের মাধ্যমে। ফ্রান্সের মানবাধিকার যেমন তাদের ওপর এই অত্যাচারে কোন অপরাধবোধ করছে না। তেমনি ইউরোপীয়

৭৮

মানবাধিকার কমিশন এ বিষয় নিয়ে টু শব্দও করবে না। বরং উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মত করে হিট ক্যাপসূলের যে আক্রমণ তার দায় মুসলমানদের ঘাড়েই চাপানোর চেষ্টা করবে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্তি কবে আসবে?

কারো মুখে কোন কথা নেই। এগিয়ে চলছে গাড়ি।

প্যারিস ক্রিসেন্ট ক্লিনিকের এমারজেন্সি ওয়ার্ড।

অনেকগুলো ছেলে ও মেয়ে ডা.ক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আহত মুসলিম ছাত্রীদের নিয়ে। এদের মধ্যে ফাতমার ভাই যুবায়েরও রয়েছে।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ফাতমা।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের চীফ সার্জন ডা. ওমর ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়ের এগিয়ে এল ফাতমার দিকে।

ওমর ফ্লেমিং বৃটিশ মুসলিম। বয়স পঞ্চাশের মত। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'তুমি নাকি ডা. যুবায়েরকে বলেছ 'হিট ক্যাপসূল' থেকে আঘাত পেয়েছে মেয়েরা?' ফাতমাকে লক্ষ্য করে বলল ডা. ওমর ফ্লেমিং।

'জি, বলেছি।'

ওমর ফ্লেমিং-এর কপাল কুঞ্চিত হলো। বলল, 'অসম্ভব, তুমি জানলে কি করে? ক্লিনিক্যাল টেস্টের পর গত সপ্তাহে এই গোপন অস্ত্র বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমি এ কথাটা শুনেছি রেডিয়েশন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর গিলস ডে বোর-এর কাছে গতকাল। ডা. যুবায়ের না বললে আমি জানতে পারতাম না এগুলো 'হিট ক্যাপসুল'- এর আঘাত।'

'আমি কিছুই জানি না। যিনি গাড়িতে আহতদেরসহ আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি আমাদের একথা বলেছেন।'

'কে তোমাদের নিয়ে এসেছে?'

'একজন যুবক। তাঁর সাথে আছেন বুরবো রাজকুমারী প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। ঐ যুবকটি মুসলমান।'

‘কি বলছ তুমি? বুরবো রাজকুমারী এখানে এসেছেন? ঐ যুবকটির সাথে এসেছেন? এবং ঐ যুবকটি মুসলমান? অবিশ্বাস্য কথা। তুমি সত্যই জান মেয়েটি বুরবো রাজকুমারী এবং যুবকটি মুসলমান?’

‘কোন সন্দেহ নেই। রাস্তায় ঘটনা আরও মজার ঘটেছে। একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করছিল দু’জন পিস্তলধারী সন্ত্রাসী। যুবকটি গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে পিস্তলধারী দু’জনকে খালি হাতে নাস্তানাবুদ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে। বিশালদেহী সন্ত্রাসী দু’জনকে যুবকটির কাছে খেলার পুতুল বলে মনে হয়েছে।’

চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল ডা. ফ্লেমিং ও ডা. যুবায়েরের।

কোন কথা বলল না তারা।

ফাতমাই কথা বলল আবার। বলল, ‘হিট ক্যাপসূল’-এর শুধু নাম বলাই নয়, এটা কি দিয়ে কিভাবে ছুঁড়তে হয়, কিভাবে যায়, কিভাবে ক্রিয়া করে, প্রতিক্রিয়া কি কি হয় ইত্যাদি সব কথাই তিনি বলেছেন।’

‘ওরা কোথায়?’

‘ওয়েটিং রুমে বসে আছেন।’

‘আছেন এতক্ষণ?’

‘আমি অনুরোধ করেছি।’

ডা. ওমর ফ্লেমিং ডা. যুবায়েরের দিকে চেয়ে বলল, ‘এরা কাজ করছে। চল আমরা একটু কথা বলে আসি।’

ওয়েটিং রুমে নয়, আহমদ মুসা ও ডোনা বসেছিল ডা. ওমর ফ্লেমিং এর অফিস কক্ষেই।

ফাতমা ডা. ফ্লেমিং ও ডা. যুবায়েরকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

৮০

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা ও ডোনা।

ফাতমা ডা. ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়েরকে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের সাথে।

ডা. ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়ের দু’জনে ঠিক বাউ করলো না, কিন্তু সামনের দিকে একটু মাথা ঝুঁকাল। ডা. ফ্লেমিং সসম্মানে ডোনাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

‘আমাদের সৌভাগ্য যে, এক উপলক্ষে আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হলো। আমরা খুশি হয়েছি। আপনার সম্মানিত পিতার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা।’

‘আমি আপনার মেয়ের বয়সের। আমাকে ঐভাবে সম্বোধন করলে আমি এখানে বসতে পারবো না।’

‘ধন্যবাদ তোমাকে।’ বলে বসতে বসতে ডা. ফ্লেমিং আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ইতিমধ্যেই ফাতমা আপনার সম্পর্কে যা বলেছে তাতে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। পরিচিত হতে এসেছি আপনার সাথে। ভীষণ খুশি হয়েছি জেনে যে আপনি মুসলমান।’

থামল ডা. ফ্লেমিং। আহমদ মুসা ও ডোনার দিকে একবার চেয়ে বলল, ‘একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করলে কি রাগ করবেন আপনারা?’

‘মোটেই না, করুন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিছু মনে করবেন না, আপনাদের পরিচয় যেহেতু দুই প্রান্তের, তাই আমার জানতে ইচ্ছা করছে আপনাদের দু’জনের মধ্যে কি সম্পর্ক?’

প্রশ্নটা বিদঘুটে এবং একেবার নগ্ন।

ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। আহমদ মুসার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে ছোট্ট এক টুকরো হাসি।

আহমদ মুসার দিকে তাকানোর পর মুখটা একটু নত করেছিল ডোনা। পরক্ষণেই মুখ তুলে সলজ্জ হেসে বলল, ‘কি উত্তর দেব আমি বুঝতে পারছি না।’ বলে আবার মুখ নামিয়ে নিল ডোনা।

ফাতমাসহ সবারই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডোনা উত্তর দিতে না পারলেও ডোনার লাজরাঙ্গা মুখ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে দিয়েছে।

‘ঠিক আছে। বেশ। তাতে কি।’ মুখে স্নেহের হাসি টেনে বলল ডা. ফ্লেমিং।

ডা. ফ্লেমিং-এর কক্ষের দরজায় পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল বয়স্ক একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। তারা শুনছিল কথাগুলো। কক্ষে ঢুকবে কি ঢুকবে না চিন্তা করছিল। তারা ওয়ার্ডে একজন মেয়ের কাছ থেকে দু’জন অতিথির কথা শুনেছে পথের সব কাহিনীসহ। জেনেছে অতিথিদের

একজন মুসলিম যুবক, আরেকজন প্রিন্সেস মারিয়া। সাগ্রহে তাদের সাথে দেখার করার জন্যেই এসেছে। পর্দার দু'ভাগের মাঝখান দিয়ে তারা দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছে।

ডা. ফ্লেমিং থামতেই আহমদ মুসা ঈষৎ হেসে জড়তাহীন অত্যন্ত সরল কন্ঠে বলল, 'একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওর সাথে আমার পরিচয়। তারপর স্পেন ও ফ্রান্সে বেশ কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা আমাদের বার বার দেখা করিয়েছে। সামনে আরও কিছু ঘটবে কিনা আমরা দু'জন কেউ তা জানি না।'

পর্দার এপারে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের চোখে-মুখে আনন্দ উপচে উঠল।

'চমৎকার, চমৎকার জবাব। এটা পৃথিবীর যে কোন উন্নত সাহিত্যের একটা অংশ হতে পারে!' কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দু'জন পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

ভদ্রলোকটি আবু আমের আব্দুল্লাহ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ফাতমার আব্বা এবং ভদ্রমহিলার নাম খাদিজা। ফাতমার আম্মা। বিক্ষোভ মিছিলে গন্ডগোল্লের খবর শুনে তারা ছুটে এসেছে ক্লিনিকে।

তারা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডা. ফ্লেমিং ও যুবায়ের উঠে দাঁড়াল। তাদের সাথে অন্যে সকলেই। প্রবেশ করেই বলল, 'সকলের কাছে মাফ চাচ্ছি, এই অসৌজন্যমূলক প্রবেশের জন্যে। আরও মাফ চাচ্ছি, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনার জন্যে।'

ফাতমা এসে তার আব্বা-আম্মার মাঝখানে দাঁড়াল। আহমদ মুসা ও ডোনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমার আব্বা, ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ফরাসী ভাষায় কবিতা ও গল্পও লেখেন। কয়েক বছর আগে রিটায়ার করেছেন অধ্যাপনা থেকে। আমার আম্মা ও আমরা চার জেনারেশন ধরে ফ্রান্সে আছি।'

ফাতমা আহমদ মুসাদের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে তার আব্বা বলল, 'বলতে হবে না, নাবিলা ন্যান্সির কাছে সব শুনেছি ইতিমধ্যেই।'

নাবিলা ন্যান্সিও আহত মেয়েদের সাথে আহমদ মুসার গাড়িতে এসেছিল।

বসল সবাই।

ডা. ফ্লেমিং বলল, 'এই যুবকই আহতদের দেখে বলেছে 'হিট ক্যাপসূলে' মেয়েরা আহত হয়েছে। উনি না বললে এতক্ষণও আমরা বুঝতে পারতাম না যে, কিসে এমনটা ঘটল। তার ফলে যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা আমরা শুরু করতে পারতাম না। তাই আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলাম সেই সাথে আমার জানার আগ্রহ হয়েছিল, সপ্তাহ খানেক আগে বাজারে চালু হওয়া এই মারণাস্ত্র সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত কিভাবে জানতে পারলেন?'

'সপ্তাহ খানেক আগে বাজারে এসেছে ঠিক, কিন্তু 'স্ট্রাটেজিক জার্নাল' এবং 'ওয়ার্ল্ড সাইন্স' এক বছর আগে এই আবিষ্কার সম্পর্কে লেখে।'

'জার্নাল দুটির নাম শুনেছি। কোনদিন দেখিনি। এ দু'টি দুর্লভ জার্নাল তাহলে আপনি নিয়মিত পড়েন?'

'জি।'

'আমার মত একটু-আধটু পড়ুয়া এবং জ্ঞান-গবেষণায় ব্যস্ত যারা, তারা তো কুংফু, কারাত বা মারামারি থেকে দশ যোজন দূরে থাকে।কিন্তু বাছা শুনলাম তুমি পিস্তলধারী দুই গুন্ডাকে খালি হাতেই সাবাড় করেছ। দুইতে তো মিলছে না বৎস!'

আহমদ মুসা একটু হাসল এবং বলল, 'মানুষ বলতে পরিপূর্ণ মানুষ বুঝায়। মানুষকে পূর্ণ হতে হলে তো তাকে সব যোগ্যতাই অর্জন করতে হবে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য। মুসলমানদের আল্লাহ উত্থান ঘটিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে। অন্য কথায় পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে। নেতৃত্ব দিতে হলে তো সব যোগ্যতাই তাদের অর্জন করতে হবে। অন্তত প্রতিটি মুসলমানকে একই সাথে গৃহী, পুলিশ ও সৈনিকের ভূমিকা পালনের মত যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। ইতিহাস বলে এই যোগ্যতা যখন আমরা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি, মুসলমানদের পতন শুরু হয়েছে তখন থেকেই। আর......।'

'থাম থাম বৎস! বলে ফাতমার আব্বা আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'একটু দাঁড়াও একথাগুলো আমি লিখে নিই। আমার জীবনে এমন কথা শুনিনি।' বলে কাগজ-কলম বের করল ফাতমার আব্বা।

এরপর ফাতমার আব্বাই প্রথম কথা বলল, ‘কোটেশনের সাথে যার কোটেশন তার নাম থাকতে হয়। নামটা তোমার বল বৎস!’ বলে চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল। তাকাল ডোনার দিকে। তারপর ফাতমার আব্বার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘লিখুন, আহমদ মুসা।’

ফাতমার আব্বা মাথা নিচু করল লেখার জন্যে। কিন্তু লিখতে শুরু করেই হঠাৎ মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, ‘কোন আহমদ মুসা?’ তার কন্ঠে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার উচ্ছ্বাস।

আহমদ মুসা ও ডোনা ছাড়া সবার চোখে-মুখেই এই একই বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা।

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

ডোনার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। ঠোঁটে তার গৌরবের হাসি।

‘বাড়ি তোমার কোন দেশে?’ ফাতমার আব্বাই প্রশ্ন করল।

‘কোন দেশেই আমার বাড়ি নেই।’

‘নেই? তোমার দেশ?’

‘আমার কোন দেশ নেই।’

‘দেশও নেই? তুমি কোন দেশের নাগরিক?’

‘প্রায় সকল মুসলিম দেশের নাগরিকত্ব আমার আছে।’

শুধু ফাতমার আব্বার নয় অন্যে সকলের দৃষ্টিও বিস্ময়ে বিস্ফারিত। পিনপতন নীরবতা।

‘কোন দেশ থেকে তুমি ফ্রান্সে এসেছিলে?’

‘মধ্যএশিয়া থেকে।’

‘মধ্যএশিয়ার কোন দেশ থেকে?’

‘সিংকিয়াং থেকে।’

‘সিংকিয়াং-এ কোন দেশ থেকে?

‘স্পেন অথবা বলা যায় ফ্রান্স থেকে।’

‘স্পেনে এসেছিলে কোত্থেকে?’

‘বলকান বা যুগোশ্লাভিয়া থেকে।’

‘সেখানে?’

‘ককেশাস থেকে।’

‘ককেশাসে?’

‘মধ্যএশিয়া থেকে।’

‘সেখানে?’

‘মিন্দানাও।’

‘আর মিন্দানাওয়ে?’

‘ফিলিস্তিন।’

‘ফ্রান্স থেকে কোথায় যাবে?’

‘জানি না, ঘটনা যেখানে নিয়ে যায়।’

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ফাতমার আব্বা।

ফাতমা, ডা. যুবায়ের, ডা. ফ্লেমিং সবাই বিস্ময় বিমূঢ়।

ফাতমার আব্বা উঠে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল আহমদ মুসার চেয়ারের পাশে। আহমদ মুসার একটি হাত নিয়ে চুমু খেল এবং হু হু করে কেঁদে উঠল। বলল, ‘তুমি আমাদের স্বপ্নের আহমদ মুসা! আল্লাহ নিয়ে এসেছেন আমাদের মাঝে। তাঁর অপার করুণা।’ বলে বৃদ্ধ দু’হাত ওপরে তুলল মোনাজাতের জন্যে।

সবার চোখ সিক্ত হয়ে উঠেছে। ডোনারও। ফাতমারও। বৃদ্ধের বাঁধ ভাঙ্গা আবেগ সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করেছে।

‘মাফ করবেন, আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। যে ভালবাসা আমি আপনাদের কাছে পেয়েছি, বিনিময়ে আমি কিছুই করতে পারিনি।’ ভারী কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘বিনয় তোমার মহত্ব। তুমি তো এখনই বললে, তোমার বাড়ি নেই, দেশ নেই। কেন নেই? জাতির জন্যেই তো। জাতিকে তুমি তোমার সবটুকুই দিয়ে দিয়েছো।’ বলল ফাতমার আব্বা।

সবাই নীরব।

ফাতমা, যুবায়ের, ওমর ফ্লেমিং কারও মুখে কোন কথা নেই, সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। সবার অনিমেষ দৃষ্টি আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ।

বৃদ্ধই আবার কথা বলল, 'কি যে আনন্দ লাগছে! জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ আমার আজ। তোমার কাহিনী শুনেছি আর কত যে ভেবেছি, আমার বয়স থাকলে তোমার সাথী হতাম তোমার ফায়ফরমাস খাটার জন্যে।'

'আমি দুঃখিত, এ ধরনের কথা বলে আমাকে কষ্ট দেবেন না।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলল, 'আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুব আনন্দ লাগছে। এর আগেও ফ্রান্সে এসেছি, কিন্তু এখানকার মুসলিম কমিউনিটির সাথে মেশার সুযোগ পাইনি। এবার সে সুযোগ হলে আপনাদের সাথে এবং অন্যদের সাথে দেখা অবশ্যই করব। আমি এখন উঠতে চাই।'

'অসম্ভব এভাবে আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি না।' বলল বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গেই ফাতমা বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সিটি হলে আমাদের একটা প্রতিবাদ সভা হচ্ছে। সেখানে আপনাকে না নিয়ে ছাড়বো না আমরা।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বোন আমি খুশি হতাম ওখানে যেতে পারলে। কিন্তু যাওয়া হবে না। আমি এসেছি সে কথা ফরাসী সরকার ও পুলিশকে আমি এখনো জানতে দেইনি। ছদ্মনামে আমি এয়ার পোর্টে নেমেছি। এর পরও ওখানে গেলে যে আমার পরিচয় প্রকাশ হবে, সেটা আমি ভাবছি না। ওখানে গেলে তোমাদের ক্ষতি হবে, এ জন্যেই আমি সেখানে যাব না।'

'ঠিক আছে ওখানে নয়, আমার গরিবালয়ে যেতে হবে। আমার গরিবালয়ের কপালে ইতিহাসের এক তিলক পরাতে চাই। আমার এ আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করতে পারবে না।' ফাতমার আব্বার কন্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল।

'আমাকে অপরাধী করবেন না। একটু অবসর হলেই আমি আসব। এখন আমার সমস্ত চিন্তা মনোযোগ অন্য একটা বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ। এখন থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি প্যারিস থেকে বেরিয়ে যাব।'

কথাটা শুনেই ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

‘একটা প্রশ্ন করতে পারি?’ বলল ডা. যুবায়ের, ফাতমার ভাই।

‘অবশ্যই।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘দু’টি প্রশ্ন। এক, আমি পড়েছি এবং শুনেছি, বড় ও গুরুতর কিছু ঘটলেই আপনি সেখানে যান। স্পেনে যে বিরাট কাজ করেছেন, সে উপলক্ষেই গতবার আপনি ফ্রান্সে এসেছিলনে। আপনি যখন ফিরে এসেছেন, নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। আপনার কথা থেকেও সেটা বুঝলাম। বিষয়টা কি?’

দুই, আপনার প্যান্ট ও জুতায় রক্তের ছিটা দেখেছি, এটা কোন ঘটনার ইংগিত দেয়। আমার কৌতূহল সেটা কি?’

‘দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটাই প্রথম দেই।’ বলে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘শত্রুর ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়ে সেই শত্রুর ফাঁদে পড়েছিলাম। তারা আমাকে একটা গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা ছিল চারজন। পথে একটা পার্কের বুশ টয়লেটে ওদের আটকে রেখে আমি ওদের ঘাঁটিতে যাই। কিন্তু......।’

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে ফাতমা বলল, ‘ওরাই তো আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আপনি ওদের আটকালেন কিভাবে?’ ফাতমা এবং অন্যদের চোখে আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা ঠিকরে পড়ছে।

আহমদ মুসা কাহিনীটা বলে আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আমি যাদের আটকে রেখে গিয়েছিলাম তারা ওয়্যারলেসে আমি তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছার আগেই আমার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং ঘাঁটির লোকরা আমার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে ছিল। আমি তাদের ফাঁদে পড়ে যাই। তারা তিনজন যখন আমাকে বাঁধতে যাচ্ছিল, তখন ডোনা মানে আপনাদের প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন পিস্তলের গুলীতে ঐ তিনজন লোককে হত্যা করে আমাকে উদ্ধার করে। তাদেরই রক্তের ছিটা আমার প্যান্টে ও জুতায়।’

‘প্রিন্সেস তো আপনার সাথে ছিল না, তাহলে কিভাবে......?’

জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করল ডা. ফ্লেমিং।

‘আমি বিপদে পড়ব- এই আশংকায় সম্ভবত ডোনা আমার অলক্ষ্যে আমাকে ফলো করছিল।’ বলে আহমদ মুসা সার্ভিস সেন্টারে আসার সময়ের কাহিনী জানাল।

ডোনার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। সে মুখ নিচু করে বসেছিল।

'আপনি বুশ টয়লেটে বন্দী রেখে ওদের ওয়্যারলেস করা সুযোগ দিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ডা. যুবায়ের।

'ওদের বিপজ্জনক মনে না করা এবং তাদের সার্চ না করা আমার ভুল হয়েছিল। আর বন্দী না রেখে হত্যা করতে পারতাম, তাহলে সব বালাই চুকে যেত। কিন্তু আমি নিজের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন ছাড়া হত্যাকান্ড ঘটাই না।'

'কেন কথা আছে না, শত্রুর শেষ রাখতে নেই!' বলল ফাতমার আব্বা বৃদ্ধটি।

'ওটা ইসলামের নীতি নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝিয়ে বলুন।' বলল ফাতমা।

'ইসলাম চায় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে দুনিয়ার সবাইকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করতে। শত্রুও এর মধ্যে শামিল।সুতরাং শুধু শত্রুর বিনাশ নয়, তাকে যতটা সম্ভব আল্লাহর বান্দা হবার সুযোগও দিতে চায় ইসলাম।'

'ফ্রান্সের যাদের সাথে আপনার এই সংঘাত, সেই শত্রু কারা?'

'ব্ল্যাক ক্রস।'

'ব্ল্যাক ক্রস?' এক সাথে ফাতমার আব্বা, ডা. ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়েরের কন্ঠ আঁৎকে উঠে উচ্চারণ করল।

আঁৎকে ওঠা কন্ঠ মিলিয়ে না যেতেই ডা. যুবায়ের বলে উঠল, ব্ল্যাক ক্রস সাংঘাতিক বড় প্রভাবশালী এবং সাংঘাতিক শক্তিশালী খুনী সংগঠন। প্রথম দিকে একে নির্দোষ এনজিও মনে করতাম। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে, খৃস্টানদের ন্যায়-অন্যায় যে কোন স্বার্থে রক্ষা এবং মুসলমানদের ক্ষতি বা বিন্যাশ করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি ইউরোপে নেই। মুসলিম ছাত্রীদের ওপর আজ যা ঘটল, আমি মনে করি এটাও ব্ল্যাক ক্রসের পরিকল্পনা।'

'ঠিকই বলেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কিভাবে এদের সাথে আপনার যোগাযোগ ও সংঘাত বাঁধল?' বলল যুবায়ের।

‘প্রথম প্রশ্নের জবাবেই এটা পেয়ে যাবেন।’ বলে আহমদ মুসা ওমর বায়ার সাথে তার দেখা হওয়া থেকে শুরু করে ওমর বায়ার সমস্ত কাহিনী, তার সর্বশেষ কিডন্যাপ হওয়া, তাকে উদ্ধারের জন্যে তার ফ্রান্সে আসা, ব্ল্যাক ক্রসের সাথে তার সংঘাতের সব কাহিনী বর্ণনা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘এ পর্যন্ত ব্ল্যাক ক্রসের প্রায় জনা চল্লিশেক নিহত হয়েছে, কিন্তু ওমর বায়ার সন্ধান এখনও পাইনি, তাকে উদ্ধারের কাজ এখনও শুরুই করতে পারিনি।’

ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ, ডা. ওমর ফ্লেমিং, ডা. যুবায়ের, ফাতমা সকলেই বলা যায় রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল আহমদ মুসার কাহিনী।

আহমদ মুসা থামার পর ধীরে ধীরে মুখ খুলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আব্দুল্লাহ। বলল, ‘তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে আরও বড় দিল দিন, আরও যোগ্যতা দিন এবং আরও বড় সাফল্য দিন। তুমি মাত্র একজন মানুষ, একজন ভাইকে উদ্ধারের জন্যে ফ্রান্সে এসেছে এবং এত বড় বিপদে জড়িয়ে পড়েছে!’

‘জনাব, ওমর বায়া এখন একজন ব্যক্তি মাত্র নয়। সে সমগ্র ক্যামেরুনের মুসলিম স্বার্থের প্রতীক। তার বিজয় সেখানে নতুন বিজয়ের যাত্রা সূচিত করবে। আর পরাজয় সেখানকার মুসলিম ভবিষ্যতকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দেবে। এই অস্তিত্বের সংগ্রামে আমরা বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে পারি না।’

‘আল্লাহ আপনাকে সফল করুন। আমাদের কিছু করণীয় নেই?’ বলল ডা. যুবায়ের।

‘আপাতত নেই। ওমর বায়ার সন্ধান পাবার পর এমন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিতেও পারে। তবে আমি চাই না এখনকার কম্যুনিটিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে ব্ল্যাক ক্রসকে তাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি খেপিয়ে তুলতে।’

‘আপনি প্যারিসের বাইরে কোথাও যাবেন বললেন?’ বলল ফাতমা।

‘ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারের সন্ধানে।’

‘কোথায়?’ ফাতমাই বলল।

‘কোথায় যদি জানতে পারতাম!’

‘তাহলে কোথায় যাবে?’ বলল ফাতমার আব্বা।

'ইংলিশ চ্যানেলের মুখে কোন এক শহর, সেই শহরের এক ঐতিহাসিক গীর্জায় ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার। আমি সেই শহর এবং সেই গীর্জা খুঁজে বের করব।'

'কি বললে ইংলিশ চ্যানেলের মুখে শহর এবং সেখানকার ঐতিহাসিক গীর্জা?'

স্বগতোক্তির মত কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করল বৃদ্ধ আবু আমের আবদুল্লাহ।

অল্পক্ষণ পরে চোখ খুলে বলল, 'তুমি কিভাবে এগোবে ঠিক করেছ?'

'গীর্জার ডাইরেক্টরি থেকে দেখব ইংলিশ চ্যানেল মুখের কয়টি শহরে ঐতিহাসিক গীর্জা আছে। তারপর গীর্জা ভিত্তিক অনুসন্ধান চালাব।'

'এজন্যেই তুমি আহমদ মুসা। ভুল পথে তুমি চল না।'

একটু থামল বৃদ্ধ। তারপর একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'ঐ এলাকায় ব্যাপক ঘুরেছি। থেকেছিও অনেক সময়। তোমাকে বোধ হয়ে কিছু সাহায্য করতে পারি। শহরটি যদি ইংলিশ চ্যানেলের মুখে হয়, তাহলে এ শহর সন্ধান করতে হবে উত্তরে সেন্ট মালো উপসাগর থেকে দক্ষিণে ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলের শীর্ষ পর্যন্ত। আর যেহেতু বলা হয়েছে শহরটি সাগর উপকূলের মুখে, তাই এ শহরটিকে অবশ্যই সাগর তীরে হতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য দু'টিকে সামনে রেখে ঐ অঞ্চলের চারটি শহর আমাদের বিবেচনায় আসে। সর্ব উত্তরে পামপুল,তাঁর পরের শহরগুলো হলো, পেরেজ গিরেক,সেন্ট পোল ডে লিউন এবং প্লেগেমো। এখন দেখতে হবে এ শহরগুলোর কোনটিতে কি কি ঐতিহাসিক গীর্জা রয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে ফ্রান্সের পুরাকীর্তি আমার একটি পাঠ্য বিষয় ছিল। সেই জ্ঞান থেকে আনি বলতে পারি, এ চারটি শহরে কোথাও কোন ঐতিহাসিক গীর্জা নেই। থাকতে পারে না। কারন শহর চারটি বলা যায় সাম্প্রতিক কালের। কোনটারই বয়স 'একশ' বছরের বেশি নয়। প্লেগেমো শহরের পূর্ব দিকে বিখ্যাত শহর ব্রিস্টে তিনটি ঐতিহাসিক গীর্জা রয়েছে। কিন্তু শহরটিকে ইংলিশ চ্যানেলের মুখে বলা যায় না।

থামল বৃদ্ধ। শুরু করল আবার। বলল, 'তবে ঐ চারটি শহরে ঐতিহাসিক গীর্জা না থাকলেও ঐতিহাসিক নামের গীর্জা আছে, যাদের বয়স খুব কম নয়'।

'কয়টি গীর্জা এমন আছে? বলল আহমদ মুসা। তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'এরকম গীর্জা দু'টি আছে। একটি পেরেজ গিরেকে। নাম সেন্ট অগাস্টাস। অন্যটি সেন্ট পোল ডে লিউন-এ। নাম চার্চ শার্লেম্যান'।

চোখের ওজ্জ্বল্য গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ্। ধন্যবাদ আপনাকে। অমুল্য সাহায্য আপনি আমাকে করলেন। পথ আমি পেয়ে গেছি। আমি মনে করি চোখ বন্ধ করে আমি এখন অগ্রসর হতে পারবো'।

'কোনটার ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত হতে পেরেছেন?' বলল ডাঃ জুবায়ের।

'আমার ফার্স্ট প্রাইওরিটি 'চার্চ শার্লেম্যান' এবং সেকেন্ড প্রাইওরিটি 'সেন্ট অগাস্টাস'।

'চার্চ শার্লেম্যান ফার্স্ট প্রাইওরিটি কেন?' বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ।

'কারন শার্লেম্যান-এর আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে ব্ল্যাক ক্রসের আদর্শ ও লক্ষ্য মিলে যায়'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সবার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'অনুমতি দিন আমাদের এবার উঠতে হবে'।

'আমার একটা কথা আছে'। বলল ফাতমা।

'বল'। বলল আহমদ মুসা।

'ভেনিসে আপনি মেয়েদের সম্মেলনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জুমার জামাতেও আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাহলে আমাদের সম্মেলনে যেতে আপনার অসুবিধা কি?'

'একথা তুমি জানলে কেমন করে?'

'আয়েশা আপা আমাকে বলেছেন। মনে আছে আপনার তাঁর কথা?'

‘অবশ্যই। কিন্তু তাঁর সাথে তোমার পরিচয় ও দেখা কিভাবে?’

‘উনি আমি সকলেই তো ‘ইয়ুথ সোসাইটি অব ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ (YSOUR)-এর সদস্য। ডাঃ জুবায়ের ভাইয়াও সদস্য’।

‘খোশ আমদেদ তোমাদের’-বলে আহমদ মুসা উঠে দাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল ডাঃ জুবায়েরের সাথে। আনন্দের বন্যায় উজ্জ্বল আহমদ মুসার চোখ-মুখ। বসতে বসতে সে বলল, ‘এই ইয়ুথ সোসাইটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী। ইউরোপে এ এক নতুন রেনেসাঁ নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্’।

ডাঃ ফ্লেমিং, জুবায়ের, ফাতমা এবং ফাতমার আব্বা আম্মা এক সাথে আমীন বলে উঠল।

আহমদ মুসা বলল, ‘আমি ভেনিসে মেয়েদের সম্মেলনে গিয়েছিলাম, জুমআর জামাতেও বক্তৃতা দিয়েছিলাম, কারন তখন আমার কর্মক্ষেত্র স্পেনে। ফ্রান্সের সরকার কিংবা ফ্রান্সের কারো সাথে আমার তখন সংঘাত ছিলনা। সুতরাং আমার উপস্থিতি তখন ক্ষতিকর ছিল না, যেমনটা এখন হতে পারে’।

‘তাহলে আমাদের সম্মেলনে আপনি লিখিত একটা বানী দিন’। বলে ফাতমা এক শিট কাগজ ও একটা কলম তুলে ধরল আহমদ মুসার সামনে।

কাগজ হাতে নিয়ে বানী লিখল তাতে আহমদ মুসা। লেখা শেষ করে কাগজ তুলে দিল ফাতমার হাতে।

ফাতমা দাড়িয়ে লেখা দেখছিল।

‘ধন্যবাদ’ বলে ফাতমা কাগজ হাতে নিল।

‘পড়তো মা। ম্যাসেজটি আমরাও শুনি’। বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ।

ফাতমা তাঁর সীটে ফিরে গিয়ে দাড়িয়ে থেকেই পড়া শুরু করলঃ

‘এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের ভাইবোনদের প্রতি।

অমুসলিম সমাজে মুসলমানদের উপস্থিতি বা আগমন, মরুভূমির অতিমুল্যবান দুর্লভ বৃষ্টির মতো। কিন্তু মরুভূমির আগুনে আগ্রাসী বাতাস যেমন শুষে নেয় মরুভূমির বৃষ্টির ধারাকে, অমুসলিম সমাজের শান ও পরিবেশও তেমনি চায় মুসলিম নামক শান্তির নির্ঝরণীকে নিরস্তিত্ব করতে। ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের,

সত্যের সাথে মিথ্যার এ এক নিরন্তন সংঘাত। এই সংঘাত মুসলিম জীবনের শুধু অলংকার বা অহংকার নয়, জান্নাতের সোনালী সড়কও।

মাথায় ওড়না পড়া নিয়ে ফ্রান্সের মুসলিম মেয়েরা যে বিপদে পড়েছে, তাঁকে আমি বিপদ মনে করি না, কোন সংকট মনে করি না। যাকে আমি বিপদ ভাবছি, সংকট মনে করছি, তা আমাদের আত্মোপলব্ধিকে শাণিত করতেই সাহায্য করবে এবং সৃষ্টি করবে এমন এক সক্রিয়তা যা সেই শাণিত উপলব্ধিকে দান করবে অপরুপ রুপময়তা। অন্যদিকে এই বিপদ অমুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশের মধ্যে নিয়ে আসবে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতি। এই দুটি দিকের পরিপুরকতা এগিয়ে দিবে দেবে মুসলিম সমাজকেই। সুতরাং এই ধরনের বিপদ মুসলিম সমাজের জন্যে অগ্রগতির রজত সিঁড়ি। এই অগ্রগতির পথে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু অধৈর্য ও হঠকারিতা। আইন ভাঙ্গা নয়, আইনের পরিবর্তনের জন্যেই সংগ্রাম করতে হবে মুসলমানদের। এই সংগ্রামে নির্যাতন যত বাড়বে মুসলমানরা ততো লাভবান হবে এবং ক্ষতি হবে নির্যাতনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠদের এবং এভাবেই বিজয় আসবে ফ্রান্সের মুসলমানদের এবং একদিন তারা সংখ্যালঘিষ্ঠতা থেকে উপনীত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠতায়।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহ্‌র রহমত এবং তাঁর সাহায্যের। আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের জন্যে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানে-মানে, ঈমানে-আমলে, দূরদর্শিতা ও দক্ষতা সব দিক দিয়েই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে মুসলমানদের। এই যোগ্যতা অর্জনের দিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইসলামই আজ একমাত্র জ্ঞান ও যুক্তির ধর্ম। জ্ঞান ও যুক্তি দিয়েই আমাদের বিশ্ব জয় করতে হবে। ইসলামের এই বিশ্ব জয়ের সংগ্রামে আপনাদের, ইউরোপীয় মুসলমানদের, অগ্রণী ভুমিকা আমি প্রত্যাশা করি। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আমীন'।

পড়া শেষ করল ফাতমা। তাঁর আমীন উচ্চারনের সাথে সকলে 'আমীন' বলে উঠল। ডোনাও।

‘আমি খুব খুশি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মহান ভাইকে। তাঁর এই বানীর প্রতিটি শব্দ স্থির,প্রদীপ্ত ধ্রুবতারার মত আমাদের দিক নির্দেশনা দিবে’। বলল ফাতমা।

‘ওয়েলকাম বোন’। বলল আহমদ মুসা।

কথা বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ। বলল, ‘আহমদ মুসা তোমার বানী তোমার মতই। এতে এক সাগর কথাকে তুমি আটকে ফেলেছ। সময় থাকলে আমার অনেক জিজ্ঞাসা ছিল’।

‘দোয়া করুন, সময় যেন আল্লাহ্ দেন’। বলে আহমদ মুসা ফাতমার দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা ডোনাকে মানে মারিয়া জোসেফাইনকে তোমাদের সোসাইটির সদস্য বানিয়ে নিও’।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই ডোনা বলল, ‘নিও’ নয় ‘নাও’ বলুন এবং আজ থেকেই’।

ফাতমা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, ‘আমরা শুধু খুশি হবো না, আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পাব। এই ঘটনা আমাদের জন্যে ‘ এ গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড(একটি বৃহৎ উল্লম্ফন)’ এবার তাহলে উঠি’। বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ডোনাও।

‘আর একটি কথা’। বলে উঠল ফাতমা।

‘কি?’ বলল আহমদ মুসা।

ডোনার দিকে চেয়ে ফাতমা বলল, ‘যে পিস্তল দিয়ে তিনজন লোক মেরে মহান ভাই আহমদ মুসাকে আপনি উদ্ধার করেছেন, সেই পিস্তলটা আমি একটু দেখতে চাই’।

‘অবশ্যই দেখাব’। বলে ডোনা পিস্তল বের করল।

ফাতমা হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

ডোনা পিস্তল দিল তাঁর হাতে।

ফাতমা পিস্তলটি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমু খেল পিস্তলটায়। বলল, ‘আমি গর্বিত যে, একটি ফরাসী মেয়ে এবং একটি বুরবো রাজকুমারী এই পিস্তল ব্যবহার করেছেন ইসলামের পক্ষে’।

বলে ফাতমা পিস্তলটি ফিরিয়ে দিল ডোনার হাতে।

পিস্তল হাতে নিয়ে ডোনা সেটা আবার ফাতমার দিকে তুলে ধরে বলল, 'পিস্তলটা তোমার জন্যে উপহার আমার পক্ষ থেকে'।

'আমাকে?' বিস্ময়-আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠ ফাতমার।

'হ্যাঁ তোমাকে'।

ফাতমা পিস্তলটা হাতে নিয়ে আবার তাতে একটা চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ডোনাকে। বলল, 'আপনি আমাদের সম্মানিত রাজকুমারী। আপনি আমাদের এক মহান ভাইয়ের একান্ত আপন। আপনার এই ঐতিহাসিক উপহার আমাকে ধন্য করেছে'। ভারী কণ্ঠ ফাতমার, চোখের পাতা ভিজে উঠেছে তাঁর।

ফাতমা ডোনাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছে হেসে বলল, 'কিন্তু পিস্তল তো আপনারই বেশি প্রয়োজন ছিল'।

হাসল ডোনা। বলল, 'একেবারে নিঃস্ব হয়ে তোমাকে দান করিনি'। বলে নিচু হয়ে মোজার ভেতর থেকে কালো রংয়ের ছোট্ট একটা পিস্তল বের করল।

'আপনার তো সাংঘাতিক বুদ্ধি!' মোজার ভেতরে পিস্তল, কল্পনারও অতীত'। বলল ফাতমা।

ডোনাকে মোজার ভেতর থেকে পিস্তল বের করতে দেখে বিস্মিত হয়েছে আহমদ মুসাও। কিন্তু তাঁর বিস্ময় দৃষ্টির মধ্যে গভীর বেদনারও একটা প্রলেপ আছে।

ফাতমার উত্তরে ডোনা আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'বুদ্ধি আমার নয়। ওর বুদ্ধির সামান্য একটা অনুসরন মাত্র'।

'চাঁদ সূর্য থেকে আলো পায়। কিন্তু আমাদের কাছে আলোটা চাঁদেরই'। বলল বৃদ্ধ আবু আমের আবদুল্লাহ।

'ধন্যবাদ জনাব'। সলজ্জ হাসল ডোনা।

আহমদ মুসা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই এগিয়ে দিল তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত।

আহমদ মুসা বসল ড্রাইভিং সীটে। ডোনা তাঁর পাশে।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

সবাই হাত নাড়ছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, 'আমি বিদায় নিচ্ছি না'।

গাড়ি অনেকখানি এগিয়েছে। আহমদ মুসা শুনতে পেল; ওঁরা চিৎকার করে বলছে, 'আমরাও বিদায় দিচ্ছি না'।

৪

এলিসা গ্রেস ওমর বায়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বরাবরের মতই দরজা বন্ধ। আজ আর ঠেলা দিয়ে দেখল না, দরজা বন্ধ কিনা। ভাবল দরজা অবশ্যই বন্ধ আছে।

এলিসা গ্রেস প্রথম দিন থেকেই দেখছে মিঃ বায়া সব সময় তার দরজা বন্ধ রাখে, যতক্ষণ ঘরে থাকে। অথচ বাইরে বেরুলে দরজা বন্ধ করে না। এলিসা গ্রেস এ ব্যাপারটার অর্থ বুঝে না। অথচ তাঁদের তদারককারী মিঃ বেনহাম চান ওমর বায়ার দরজা খোলা থাকুক। যাতে বুঝা যায়, তাঁর মধ্যে কোন ভয় বা উদ্বেগ নেই বা কোন প্রকার সন্দেহ সে কাউকে করে না।

মিঃ বেনহাম অর্থাৎ বিজ্ঞানী বেনহাম ওমর বায়ার ফ্ল্যাটের পাশের আর একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। এলিসা গ্রেসের কাছে তাঁর পরিচয় সে ব্ল্যাক ক্রসেরই একজন নেতা।

বিজ্ঞানী বেনহামের থাকার ঘরটি ওমর বায়ার ঘরের সোজা দক্ষিনে প্রাচীরের মধ্যেই। একটু দুরে, তা না হলে ওমর বায়ার ঘরের জানালা দিয়ে মিঃ বেনহামের ঘরের লোকজনকে দেখা যেত। বিজ্ঞানী বেনহাম তাঁর ভিশনের অংশ হিসাবেই পরিকল্পিতভাবে ঐ ফ্ল্যাটের ঐ ঘর বেছে নিয়েছে।

এলিসা গ্রেস ভাবছিল, মিঃ বেনহাম চান ওমর বায়া দরজা খুলে রাখুক। কিন্তু তিনি এও চান যে, এই কথা ওমর বায়াকে না বলা হোক। নির্দেশ হয়েছে, এলিসাকে পরোক্ষ চেষ্টা করতে হবে যাতে সে দরজা খোলা রাখে। সরাসরি তাঁকে দরজা খোলা রাখতে বললে ওমর বায়া আরও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

এলিসা ওমর বায়ার দরজায় নক করল। বরাবরের মতই তিনবার নক করল সে।

দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিল ওমর বায়া। তাঁর গায়ে চাদর জড়ানো।

খালি গায়ে কিংবা শুধু গেঞ্জি গায়ে এলিসা কোন সময়ই ওমর বায়াকে দেখেনি। এলিসার মনে হয়েছে ওমর বায়া খুব লাজুক।

এলিসা গ্রেসের হাতে ছিল দুধের গ্লাস।

দুধের গ্লাস নিয়ে এলিসা গ্রেস ঘরে প্রবেশ করল। দরজা খুলে দিয়েই ওমর বায়া গিয়ে চেয়ারে বসেছে।

এলিসা গ্রেস দুধের গ্লাস টেবিলে রাখল। প্রথম দিকে দুধের গ্লাস ওমর বায়ার হাতে দেয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু ওমর বায়া কোন জিনিসই হাত পেতে নেয় না। এলিসা এখন আর চেষ্টা করে না হাতে দেয়ার।

'একটা কথা বলতে পারি?' চলে যাবার জন্যে হাঁটতে শুরু করেও আবার ঘুরে দাড়িয়ে বলল এলিসা।

'বলুন'। বলল ওমর বায়া।

'সব সময় ঘরের দরজা লক করে রাখেন কেন?'

'ও কিছু না। অভ্যাস বলতে পারেন'।

'না আমাকে ভয় করেন?'

'আপনাকে?'

'তাছাড়া আর কে? আমি ছাড়া এখানে আর যারা আছে চাকর বা পরিচারিকারা তাঁদের তো ভয় করার কোন প্রশ্নই উঠে না'।

'না আপনাকে ভয় পাই না'।

'তাহলে?'

'ওই তো বললাম, অভ্যাস'।

'না, অভ্যাস নয়, অভ্যাস হলে বেরিয়ে যাবার সময় ঘর বন্ধ করেন না কেন?'

সংগে সংগে উত্তর দিল না ওমর বায়া। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'ভয়ের কারন আমি নিজেই। অর্থাৎ আমি আমাকেই ভয় পাই'।

'কেন?'

'অনেক কারন থাকতে পারে। একটা কারন হলো, আমি নিজে দুর্বল'।

'কোন দিক দিয়ে?'

‘মনের দিক দিয়ে’।

‘মনের দিক দিয়ে আপনি দুর্বল নন আমি জানি। তবে হ্যাঁ, আপনি আমাকে ভয় করেন। এটা মনের ভয়’।

‘আপনাকে ভয় করি তার প্রমাণ?’

‘চাকর-পরিচারিকাদের কাছ থেকে হাত পেতে জিনিস নেন কিন্তু আমার কাছ থেকে নেন না। গায়ে চাদর চাপানো বা জামা পড়া ছাড়াই চাকর-পরিচারিকাদের সাথে আপনি দেখা করেন, কিন্তু আমার সাথে করেন না’।

এলিসা গ্রেস কথা শেষ করলে ওমর বায়া নীরব থাকল। ওমর বায়া মুখ নিচু করল। বেশ সময় নিয়ে বলল, ‘কিন্তু আপনাকে কেন ভয় করব আমি?’

‘সে প্রশ্নতাই তো আমি করেছি’।

‘এর উত্তর আমি জানি না’। মুখ নিচু রেখেই ধীরে ধীরে বলল ওমর বায়া।

‘কারন আপনি সম্ভবত আপনাকেও জানেন না’। বলে এলিসা গ্রেস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যাবার সময় এলিসা নিজেই নব টিপে দরজা নক করে গেল।

এলিসার শেষ কথাটা মনের কোথায় যেন কাঁটার মতো বিধতে লাগল ওমর বায়ার। ওমর বায়া কি সত্যি নিজেকে জানে না! না জানলে এতো নির্যাতন এবং এই বন্দী জীবন যাপন করছে সে কেন? ওদের কথায় সে রাজি হতে পারছে না কেন? একটিই কারন, ওমর বায়া নিজেকে, নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বোধ, বিশ্বাসকে জানে বলেই। তবে হ্যাঁ এলিসা গ্রেস সম্পর্কে সে নিজের মনের গভীর থেকে ভয় পায়। প্রথম দৃষ্টিতেই এলিসা গ্রেসকে সে শুধু অপরূপা নয়, আরও বেশি কিছু যেন মনে করেছে। অবশ্য সে সংগে সংগেই বুঝেছে এলিসা শক্রর অতি ধারাল এক তরবারি। এই দ্বন্দের পরিণতির দিকে তাকালে ওমর বায়া ভয় পায়। এই ভয়ই ওমর বায়ার কাছে এলিসা গ্রেসকে অন্য সব থেকে আলাদা করেছে। যার কারনে এলিসা গ্রেসের সাথে তাঁর আচরণও আলাদা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলিসার আজ বেশ ভালো লাগছে, কতকগুলো কথা বলা গেছে তাঁকে। কথাগুলো ভালই বলতে পেরেছে এলিসা। তাঁর ওপর নির্দেশ পরোক্ষ চেষ্টার মাধ্যমে ওমর বায়ার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে হবে।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে এলিসা গ্রেসের অবাক লাগছে। সত্যিই ওমর বায়া তাঁর কাছে এক অদ্ভুত যুবক। মাঝে মাঝে তাঁর সন্দেহ হয়, ওর মধ্যে কোন আবেগ, কোন সজীব মন আছে কিনা। কোন যুবক যে এমন স্বাত্তিক বা এমন চরিত্রের হতে পারে, তা কল্পনারও বাইরে ছিল তার। কিন্তু আজকের আলোচনায় এলিসার মনে হয়েছে ওমর বায়ার বাইরের কঠিন আবরণের নিচে সুন্দর সবুজ একটা মন আছে। বাইরের এ কঠিন আবরন ভাঙ্গাই আমার এ্যাসাইনমেন্ট, আমার দায়িত্ব।

এ সময় মিশেল লিটল নামক সেই মাংশ পিণ্ডটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, তাল পাতার সেপাই কি যেন নাম, হ্যাঁ, বেনহাম আপনাকে ডাকছে।

মিঃ লিটল মোটেই দেখতে পারে না বিজ্ঞানী বেনহামকে। সে বেনহামকে পাথরের মানুষ মনে করে। লিটলের মন্তব্য, বেনহামের চোখ দেখলে মনে হয় সবাইকে সে ঘৃণা করে, যেমনটা দেখা যায় ইহুদীদের চোখে। ব্ল্যাক ক্রসের কোন নেতাই তাঁর মত নয়।

ব্ল্যাক ক্রস চরিত্রগতভাবে ইহুদী বিদ্বেষী। স্কিনহেড জাতীয়তাবাদীরা ব্ল্যাক ক্রসের সাথে মিলিত হবার পর ব্ল্যাক ক্রসের এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। মশিয়ে লিটল এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করে।

মশিয়ে লিটল-এর এই মনোভাব এলিসা গ্রেসকেও স্পর্শ করেছে। সেও বেনহামকে খুব একটা পছন্দ করে না। তাকে দেখলেই এলিসার মনে হয় কি এক ষড়যন্ত্র তার চোখে-মুখে। সে যা বলে, তার পেছনে যেন আরও কথা থাকে। ব্ল্যাক ক্রসের লোকরা নিষ্ঠুর খুনী। কিন্তু এই কাজে তারা রাখ-ঢাক করে না। তাদেরকে বুঝা যায়, কিন্তু বেনহাম দূর্বোধ্য। ব্ল্যাক ক্রসের হয়েও সে এমন কেন।

বেনহামের পরিচয় এলিসা এবং অন্য কেউ জানে না। ব্ল্যাক ক্রসের একজন হিসাবে ওমর বায়ার তদারকির জন্যে পৃথক একটা ভিলায় তাকে রাখা হয়েছে।

এলিসা গ্রেস গিয়ে বিজ্ঞানী বেনহামের দরজায় নক করল।

ভেতর থেকে ভারী কণ্ঠের আওয়াজ এল, 'এস।'

দরজায় চাপ দিল এলিসা গ্রেস। খুলে গেল দরজা।

বিজ্ঞানী বেনহাম ছিল পড়ার টেবিলে। একটা মোটা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছিল সে।

এলিসা গ্রেস ঘরে ঢুকে একটু দাঁড়াল। বিজ্ঞানী বেনহামের চোখ বইয়ের উপর নিবদ্ধ।

এলিসা গ্রেস বসবে কি বসবে না চিন্তা করছিল।

এই সময় বিজ্ঞানী বেনহাম মাথা না তুলেই বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ এলিসা গ্রেস।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার।' বলল এলিসা গ্রেস।

'তুমি ওমর বায়াকে অনেক কাছে এনেছ।'

'কখন, কিভাবে স্যার?'

'না, তুমি আজ চমৎকার কথা বলেছ ওমর বায়ার সাথে।'

'আজকের কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি করে জানলেন স্যার?' এলিসা গ্রেসের চোখে-মুখে বিস্ময়।

'শুনেছি। সে কথা যাক। তুমি কেমন বুঝছ ওমর বায়াকে?'

'খুব শক্ত স্যার।'

'যেমন?'

'সে সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখে, এমনকি আমার হাতে থেকে কোন জিনিস পর্যন্ত নেয় না। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।'

'কিন্তু আজকের তার সব কথার মধ্যে দিয়ে তাকে অতটা শক্ত মনে হয়নি।'

'সব কথা আপনি শুনেছেন স্যার?' আবারও বিস্ময় ফুটে উঠল এলিসার কথায়।

কিন্তু বিস্মিত এলিসা গ্রেস একটু মাথা খাটালেই বুঝতে পারতো, এই জানার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। ওমর বায়ার টেবিলের তলায় অত্যন্ত পাওয়ারফুল কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে।

‘তুমি কিভাবে এগোবে মনে করছ?’ এলিসার প্রশ্নের দিকে কান না দিয়েই বলল মি. বেনহাম।

‘চেষ্টা করছি। আগের চেয়ে অনেকখানি ওপেন হয়েছে সে। কিন্তু ঘর বন্ধ করে একা থাকতেই ভালোবাসে। তার এ একাকীত্ব দূর করতে না পারলে তার মনকে সম্পুর্ণ ফ্রি করা যাবে না।’

‘তাঁর এ একাকীত্ব দূর করার জন্যে তো তুমি।’

‘কিন্তু কিভাবে? ঐভাবে যদি সে দরজা বন্ধ করে থাকে। কোন চাপ দিতেও তো আপনি নিষেধ করেছেন।’

‘অবশ্যই চাপ দেয়া চলবে না। স্বাভাবিক চেষ্টার মাধ্যমেই তোমাকে ওর ঘনিষ্ঠ হতে হবে। ওকে হাসি-খুশিতে ভরে দিয়ে মনের দিক দিয়ে সম্পুর্ণ ফ্রি করে তুলতে হবে।’

‘সর্বক্ষণ মেশার সুযোগ না পেলে এটা সম্ভব কিভাবে?’

‘সর্বক্ষণ মেশার সুযোগ তোমাকেই সৃষ্টি করতে হবে।’

‘জানি। আজ তো ওকে দরজা খুলে রাখার কথা বলেছি।’

‘তোমার উপস্থাপনা খুব সুন্দর হয়েছে। ওর কাছে এই কথা তুলে ধরার দরকার ছিল। দেখবে আগামী দু’দিনের মধ্যে ওর দরজা আপনাতেই খুলে যাব।’

‘দু’দিনের মধ্যে?’

‘হ্যাঁ, দু’দিনের মধ্যে।’

‘আর কি ঘটবে?’

‘পরবর্তী দু’দিনের মধ্যে তোমার হাত থেকে সরাসরি জিনিসপত্রও নেবে। তবে শর্ত একটা। আজ থেকে দু’দিন পর রাতে যখন দুধ দিতে যাবে, তখন তার হাতে দুধ দিতে চেষ্টা করবে। যখন দুধ নেবে না, তখন তোমাকে তাকে কিছু বলতে হবে।’

‘এটাও দু’দিনের মধ্যে? আপনি কি মনোবিজ্ঞানী স্যার?’ এলিসার চোখে বিস্ময় মিশ্রিত অনুসন্ধান।

‘তারপর তুমি কি করবে?’ এবারও বেনহাম এলিসার প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে গেল।

‘সর্বক্ষণ মেশার সুযোগ পেলে তাকে মনের দিক দিয়ে প্রফুল্ল ও ফ্রি করে তোলা যাবে।’

‘আমাদের চাওয়া কিন্তু আরও অনেক বেশি।’

‘কি সেটা?’

‘চারদিন পরে বলব। তবে এটুকু জেনে রেখ, তুমি যা বলবে সে তাই করবে, এ পর্যায়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে।’

কথা শেষ করে বিজ্ঞানী বেনহাম বইটা টেনে নিয়ে তাতে আবার মনোনিবেশ করল।

এলিসা গ্রেস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বুঝল, কথা শেষ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল এলিসা গ্রেস।

ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে আসতে ভাবল এলিসা গ্রেস, সৌজন্যবর্জিত লোকটা নিশ্চয় বেশি কথা বলে না।

কিন্তু দু’দিন পর রাত দশটায় এলিসা গ্রেস হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে যখন ওমর বায়ার দরজায় গিয়ে চাপ দিল দরজা খুলে গেল, তখন এলিসা গ্রেস সত্যিই বিস্মিত হলো। মি. বেনহামের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে অন্তত এই ক্ষেত্রে।

ঈষৎ ফাঁক হওয়া দরজায় দাঁড়িয়ে এলিসা গ্রেস বলল, আসতে পারি?’

‘আসুন।’ বলল ওমর বায়া।

ভেতরে প্রবেশ করল এলিসা গ্রেস। এগোলো ওমর বায়ার দিকে।

আজ দুধের গ্লাসটা টেবিলে না রেখে ওমর বায়ার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওমর বায়া তার হাত না বাড়িয়ে বলল, ‘টেবিলে রাখুন।’ এলিসা গ্রেসের দিকে না তাকিয়ে কথাগুলো বলল ওমর বায়া।

এলিসা গ্রেস দুধের গ্লাস রাখল টেবিলে। তারপর বলল, ‘আপনি আমার হাত থেকে কিছু নেন না, আমাকে অথবা আপনি নিজেকেই ভয় করেন বলে। এ ভয় কি যাবে না?’

‘সেদিনও আপনি এ কথাই বলেছেন। আসলে ভয় আমি কাউকে করি না। এটা আমার বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রশ্ন। যা আপনি বুঝবেন না।’

‘ধন্যবাদ। কোন সংস্কৃতিই কিন্তু মানুষকে ছোট করতে বলে না।’

‘এটা ছোট করা নয়, আরও মর্যাদা দেয়া।’

‘প্রত্যাখ্যানকে কি মর্যাদা বুঝায়?’

‘অন্যায়কে প্রত্যাখ্যানের অর্থ অবশ্যই ন্যায়কে মর্যাদা দান।’

‘বা! আপনি সুন্দর কথা বলেন। আজ আর কথা বাড়াব না। চলি। শুভরাত্রি।’ বলে এলিসা গ্রেস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দু’দিন পর রাত দশটায় দুধের গ্লাস হাতে এলিসা গ্রেস ঘরে প্রবেশ করল। দু’দিন আগের সেই সময় থেকে ওমর বায়ার দরজা আর লক হয় না।

বিজ্ঞানী বেনহাম কথিত দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় দিন। তার বক্তব্য অনুসারে আজ ওমর বায়ার এলিসার হাত থেকে জিনিস অর্থাৎ এখন দুধের গ্লাস নেবার কথা।

দোদুল্যমান মন নিয়ে এলিসা গ্রেস দুধের গ্লাস নিয়ে এগোলো ওমর বায়ার দিকে। বলা যায় কম্পমান হাতেই সে দুধের গ্লাস বাড়িয়ে দিল ওমর বায়ার দিকে।

দুধের গ্লাস সামনে যেতেই ওমর বায়া চকিতে একবার তাকাল এলিসা গ্রেসের দিকে। তারপর ডান হাত বাড়িয়ে ওমর বায়া এলিসাকে অবাক করে দিয়ে তার হাত থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে নিল।

এলিসা গ্রেসের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল। ওমর বায়ার দৃষ্টি নিচু না থাকলে সেও এলিসার বিস্ময় বিমূঢ় চেহারা দেখতে পেত।

এলিসার মুখে কোন কথা যোগাচ্ছিল না। সে ভাবছিল, মি. বেনহামের দু’টি কথাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এটা কি করে সম্ভব। অনুমান করে বা কার্যকারণ দেখে অথবা মানস-প্রবণতা লক্ষ্য করে কেউ ভবিষ্যৎ বাণী

করতে পারে কিন্তু এভাবে দিনক্ষণ বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অসম্ভব কাজ মি. বেনহাম সম্ভব করলেন কিভাবে?

প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে এলিসা গ্রেস বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কেন?'

'আমি খুশি হয়েছি।'

'কেন?'

'আপনার হাতে কিছু তুলে দেবার সৌভাগ্য হলো।'

'এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে?'

ওমর বায়ার কথায় বিস্মিত হলো এলিসা গ্রেস। ওমর বায়ার সেদিনের এবং আজকের কথার মধ্যে কত পার্থক্য! সেদিন যাকে ওমর

বায়া তার বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অংগ বলল, আজ সে ওমর বায়াই তার বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ভংগ হওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখছে না। মাত্র দু'দিনে কি পরিবর্তন! কোন যাদুমন্ত্র যেন ভোজবাজী ঘটিয়েছে।

'ধন্যবাদ। অস্বাভাবিকতা নেই বরং এটা স্বাভাবিক।' বলল এলিসা গ্রেস।

ওমর বায়া দুধ খেয়ে গ্লাস ফেরত দিল এলিসা গ্রেসের হাতে। এই প্রথম ওমর বায়া এলিসা গ্রেসের হাতে সরাসরি কিছু দিল।

বিস্মিত এলিসা গ্রেস ওমর বায়ার দিকে চোখ তুলে বলল, 'ধন্যবাদ।'

গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনার?'

'অসুবিধা নেই, কষ্ট আছে।'

'কি কষ্ট?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে জিজ্ঞেস করল এলিসা গ্রেস।

'ব্ল্যাক ক্রস আমাকে বিনা কারণে বন্দী করে রেখেছে। অথচ ওদের কোন স্বার্থ নেই।'

ওমর বায়ার কথা শুনে এলিসা গ্রেসের উদ্বেগ কেটে গেল। হেসে উঠল। হাসল প্রাণ খুলে।

‘হাসছি আপনার অমূলক কষ্টের কথা শুনে। আপনি বরং বাইরে থাকার চেয়ে এখানে ভালো আছেন। ব্ল্যাক ক্রস আপনাকে নিরাপদে রেখেছে। বাইরে থাকলে ওকুয়া’র ভয়ে হয় পালিয়ে বেড়াতে হতো, নয়তো ওদের হাতে বন্দী হতে হতো।’

‘এখনো তো আমি বন্দী আছি।’

‘সত্যিই কি এখন আপনার বন্দী থাকার মত মনে হয়?’

‘তা হয় না। এজন্যে ধন্যবাদ ব্ল্যাক ক্রসকে। কিন্তু তবুও তো আমি বন্দী।’

‘ব্ল্যাক ক্রস আপনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। আপনি শীঘ্রই ছাড়া পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক ক্রসকে বন্ধু ভাবুন।’

‘হ্যাঁ, আমিও এখন এ রকম ভাবছি।’

‘তাহলে বলুন আপনি বন্দী এ চিন্তা মনে রাখবেন না। আপনি কষ্ট পেলে আমার কষ্ট লাগে।’

ওমর বায়া চোখ তুলে তাকাল এলিসা গ্রেসের দিকে। তার মনে হলো, এত সুন্দর কথা কারো কাছ থেকে সে শোনেনি। এমন সুন্দরও কাউকে সে দেখেনি।

চোখ নামিয়ে নিল ওমর বায়া। কোন কথা বলল না।

‘আসি আজকের মত। রাত আপনার জন্য আরামদায়ক হোক। শুভ রাত্রি।’

বলে এলিসা গ্রেস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আসতে আসতে ভাবল এলিসা গ্রেস এমন সুন্দর, সংযমী মানুষও দুনিয়াতে আছে। ওর বাইরের রূপ যত কালো, ভেতরটা ততই সুন্দর। তার ভেতরের পবিত্র সৌন্দর্যের কাছে এলিসার আগুনের মত জ্বালাময়ী সৌন্দর্য খুবই নিস্প্রভ।

এলিসা তার ঘরে এসে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

এলিসা গ্রেস ধরল টেলিফোন।

'হ্যালো।'

'ধন্যবাদ এলিসা।' ওপার থেকে বিজ্ঞানী বেনহামের কণ্ঠ।

'ওয়েলকাম স্যার। কোন আদেশ?'

'না এলিসা কোন আদেশ নয়। কাল সকালে এস, নির্দেশ তখন দেব। এখন টেলিফোন করেছি তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে। আমরা তোমার কাছে যা আশা করেছি, তুমি তার চেয়েও ভালো করছ। তোমার ফিনিশিং আজ চমৎকার হয়েছে। তোমাকে পারিশ্রমিক আমরা দ্বিগুণ করে দেব।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'বেশ রাখি। কাল এস।'

টেলিফোন রেখে দিল বেনহাম।

আবার মনে খোঁচা খেল এলিসা গ্রেস। লোকটার কোন সৌজন্য বোধ নেই। এরা অধস্তনদের সামান্য 'শুভ রাত্রি' বলতেও জানে না।

টেলিফোন রাখল এলিসা গ্রেস।

আবার মনে এসে সেই বিস্ময়ই বাসা বাঁধল। লোকটা সর্বদ্রষ্টা নাকি! যা বলে তাই ঘটে, আবার ওখানে যা কথা হয় সবই শুনতেও পায়।

পরদিন ভোর।

সেদিন একটু ভোরেই উঠেছিল এলিসা গ্রেস। জগিং করে ফিরছিল সে।

লম্বা করিডোরটায় পা দিয়েই দেখল, ওমর বায়া বাইরে থেকে তার ঘরে ঢুকে গেল।

ওমর বায়ার ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে এলিসা গ্রেসের ঘরে।

ওমর বায়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এলিসা গ্রেস। এগোলো দরজার দিকে। কৌতুহলবশতই দরজার নব ঘুরাল। খুলে গেল দরজা।

একটা সুরেলা কন্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকে। ওমর বায়া কিছু পড়ছে বা বলছে।

খুব আস্তে দরজা আরেকটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল এলিসা গ্রেস। দেখতে পেল, ওমর বায়া কার্পেটের ওপর তার বড় তোয়ালেটা ফেলে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দু'টি আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা। অনুচ্চ কন্ঠে সুর করে কি যেন পড়ছে সে। বেশ মিষ্টি সুর। ভালো লাগছে শুনতে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হাঁটুতে দু'হাত রেখে কোমর পর্যন্ত বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওমর বায়া। তারপর উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণেই নিচু হয়ে মাটিতে মাথা রাখল। একটু পরেই উঠল। পরক্ষণেই আবার মাথা রাখল মাটিতে। পরে উঠে দাঁড়াল আবার।

এলিসা গ্রেস বুঝল, ওমর বায়া প্রার্থনা করছে। কিন্তু কি ধরণের প্রার্থনা এটা?

হঠাৎ এলিসা গ্রেসের মনে পড়ল বেশ অনেকদিন আগে দেখা টিভি'র একটা দৃশ্যের কথা। সে দৃশ্যে এভাবেই লোকদেরকে প্রার্থনা করতে দেখেছিল। তার মনে পড়েছে, এটা মুসলমানদের প্রার্থনার দৃশ্য।

মনে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এলিসা গ্রেস। ওমর বায়া তাহলে কি মুসলমান? তার মাতৃধর্মের লোক?'

এলিসা গ্রেস আস্তে আস্তে নব ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরে এল দরজা থেকে।

মনে একটা তোলপাড় তখন এলিসা গ্রেসের।

এলিসা গ্রেস একজন মিশ্র রক্তের মেয়ে।

এলিসার নানী আরেফা নূর তার বালিকা বয়সে আলিজিরিয়ায় ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে একজন ফরাসী যুবক কর্তৃক অপহৃত হয়ে আসে রোমে। সেখান থেকে ফ্রান্সে। এলিসা গ্রেসীর মা আনিসা গ্রেস ছিল সেই আরেফা নূরের একমাত্র মেয়ে।

এলিসা গ্রেসের মনে পড়ল তার মায়ের কথা। তার মা আনিসা গ্রেস মারা গেছে অনেক দিন আগে। নানী আরিফা নূরকে এলিসা দেখেনি। কিন্তু তার সম্পর্কে সব সময় অনেক গল্প শুনেছে এলিসা। তার মায়ের কাছ থেকেই শুনেছে তার নানীর ধর্ম ছিল ইসলাম। তার মাও তার নানীর ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে

করতেন। তার মা কোন দিনই গীর্জায় যায়নি। সুতরাং তার মাতৃধর্ম ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম। ওমর বায়া সেই ধর্মেরই অনুসারী।

এলীশা গ্রেস ধীরে ধীরে শিথিল পায়ে তার ঘরে ফিরে এল। নিজেকে সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে গা এলিয়ে দিল সোফার বুকে।

চোখ বুজে এল তার।

মনটা ছুটে গেল তার অনেক দুরের অতীতে। যখন ব্রিষ্ট নগরীর একটা ছোট্ট ফ্লাটে তার আব্বা, আম্মা এবং বড় এক ভাই নিয়ে ছিল তার পৃথিবী। মায়ের এ্যালবামে ছিল তার নানীর একটা ফটো। অবসর পেলেই তার মা বের করতেন তার নানীর সেই ফটো। মায়ের কাছে কত গল্প শুনেছে তার নানীর। ওমর বায়া যেমন বন্দী হয়েছে, তেমনি তার নানী ফুলের মত এক বালিকা অপহৃত হয়েছিল আলজিরিয়া দখলকারী ফরাসী সৈন্যদের একজনের হাতে। সেই সৈনিক ছিলেন তার নানা।

তার নানী সবই পেয়েছিলেন, কিন্তু চোখের পানি তার কোনদিন শুকায়নি। তার নানা তার নানীকে সব স্বাধীনতায় দিয়েছিল। নানী তার নিজের ধর্ম যথাসাধ্য পালন করতেন, নানা তাতে বাধা দেননি। কিন্তু নানী তার জন্মভূমি এবং তার আপনজনদের দেখার সুযোগ কোন দিন পাননি। এই বেদনাই অশ্রু হয়ে ঝরেছে তার চোখে আমৃত্যু।

এলিসা গ্রেস তার মায়ের কাছে তার নানীর বলা অনেক কাহিনী শুনেছে। শীতের দীর্ঘ রাতে মায়ের বুকে মুখ রেখে এলিসা গ্রেস শুনতো সে কাহিনীগুলো। তার নানী আরেফা নূর আলজিয়ার্সের একটি বিখ্যাত ও প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান। কিন্তু ফরাসীরা আলজিরিয়া দখলের পর এই পরিবার ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এই অভিযোগে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সত্ত্বেও আলজিয়ার্স শহরতলীর এক বাড়িতে সব হারানোর পরেও তাদের পরিবার স্নেহ ঘেরা এক সুন্দর পরিবেশে স্বর্গীয় সুখে বাস করতো। আব্বা-আম্মা ছাড়াও তাঁর নানীর ছিল দু'বোন এবং চার ভাই। এই সময়ই একদিন দূর্ভাগ্য নেমে এল তার নানীর জীবনে।

সেদিন তার চার ভাইয়ের কেউই বাড়িতে ছিল না। হঠাৎ তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার আব্বার বাইরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। তার বড় দু'বোনকেও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং বাইরে যাবার কেউ ছিল না। তখন তার বয়স ছিল পনের। মুমূর্ষু মাকে রক্ষার জন্যে মায়ের অশ্রুরুদ্ধ নিষেধ সত্ত্বেও পাগলের মত বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে ওষুধ সংগ্রহের জন্যে।

সেই যে সে বেরিয়ে আসে আর ফিরতে পারেনি। শহরের সব ওষুধ দোকান বন্ধ করে হয়েছিল, যাতে বৈরী ও বিদ্রোহীরা কোন ওষুধ না পায়। ওষুধ পাওয়া যেত শুধু ফরাসী সৈন্যের চৌকিগুলোতে।

সে ফরাসী সৈন্যের চৌকি কোথায় চিনতো না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর সে রাস্তায় পাহারারত একজন সৈন্যকে জিজ্ঞেস করে ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে।

শুনেই সৈনিকটি বলে যে, সে ওষুধের সরবরাহ কেন্দ্র দেখিয়ে দিতে পারে এবং তাঁকে গাড়িতে উঠতে বলে। সে অস্বীকার করে গাড়িতে উঠতে এবং বলে যে, কেন্দ্রটি কোথায় তা বললেই চলবে।

কিন্তু সৈনিকটি জোর করে তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। সে চিৎকার করে সাহায্য চায়। কিন্তু কেউ সাহায্য করতে আসেনি। গাড়ি চলতে শুরু করলে একজন বৃদ্ধ ছুটে এসেছিল এবং গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির গতিরোধের চেষ্টা করেছিল। বৃদ্ধের ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দেয় সৈনিকটি। গাড়ির চাকা পিষ্ট করে বৃদ্ধের দেহ।

এরপর শুরু হয় অসহায় সেই বালিকার জীবন-পরিক্রমার এক দীর্ঘ কাহিনী।

এসব কাহিনী বলতে বলতে এলিসার মা কেঁদে ফেলত। নানীর সে কাহিনী কাঁদাত এলিসা গ্রেসকেও। তার সামনে ভেসে উঠতো তার অদেখা নানীর অশ্রু সজল ছবি, ভেসে উঠতো তার সামনে রোম এবং আলজিয়ার্সের কল্পিত দৃশ্য। সে প্রশ্ন করে একদিন তার মাকে, আলজিয়ার্সে নানীর কেউ নেই? তাদেরকে পৌছে দেয়া যায় না নানীর কথা যে, নানী মৃত্যু পর্যন্ত ভোলেনি তাদের কথা এবং আমরাও তাদের স্মরণ করি।

এলিসা গ্রেসের মা কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিয়েছিল, সে চেষ্টা করেছি কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফরাসী শাসনে সেখানে নিরন্তর যে ঘূর্ণিঝড় বয়েছে, তাতে আলজিরিয়ার সবকিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সে ঝড়ে ওরা কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে!

নানীর কাহিনী শোনা সেই বয়স বহু দিন আগে চলে গেছে এলিসার। কাহিনী বলা সেই মাও গত হয়েছে অনেক দিন। জীবন যুদ্ধের ভিড়ে এই অতীতকে এলিসা গ্রেস খুব কমই স্মরণ করতে পারে। আজ ওমর বায়ার ঘটনা সময়ের দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। অতীত বর্তমানের রূপ নিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে তার চোখের সামনে। মায়ের বুকের সেই উষ্ণ পরশ যেন সে অনুভব করছে, মায়ের সেই কন্ঠ যেন শুনতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে যেন মায়ের নীরব অশ্রুও।

চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল এলিসা গ্রেসের।

টেলিফোন বেজে উঠল।

এলিসা গ্রেস উঠে চোখের পানি মুছে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

টেলিফোন বিজ্ঞানী বেনহামের। বেনহাম তাঁকে নির্দেশ দিল তার কাছে আসার জন্যে।

'আসছি স্যার!" বলে টেলিফোন রাখল এলিসা গ্রেস।

টেলিফোন রেখেই এলিসার মনে পড়ল ওমর বায়ার কথা। নিশ্চয় ওমর বায়া সম্পর্কেই নতুন নির্দেশ শুনতে হবে মি. বেনহামের কাছ থেকে।

এই ব্যাপারে এলিসা গ্রেস আগে যতোটা উৎসাহ বোধ করেছে, এই মুহূর্তে তা যেন পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে তার হতভাগিনী নানীরই যেন এক প্রতিচ্ছবি ওমর বায়া।

এলিসা গ্রেস প্রস্তুত হলো মি. বেনহামের কাছে যাবার জন্যে। কান্না ও মলিনতার ছায়া চোখ-মুখ থেকে মুছে ফেলার জন্যে হালকা মেকআপ নিল। তারপর জোর করেই হাসল কিছুক্ষণ সজীব হয়ে উঠার জন্যে। ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সাথে তার প্রায়ই দেখা হয়। এলিসা ব্রিষ্টের সবচেয়ে অভিজাত ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের সেলস গার্ল। ষ্টোরের মালিক ব্ল্যাক ক্রসের একজন অর্থ যোগানদাতা। সেই সূত্রেই ব্ল্যাক ক্রস নেতাদের সেখানে যাতায়াত। ষ্টোর

মালিকের অনুরোধেই এলিসা গ্রেস ব্ল্যাক ক্রসের কিছু কিছু কাজ করে দেয়। সে অনেক ব্ল্যাক ক্রস নেতাকে দেখেছে কিন্তু বেনহামের মত বাজ চক্ষু আর অভদ্র কাউকে দেখেনি।

এলিসা গ্রেস বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

নক করল মি. বেনহামের দরজায়।

‘এস।’ সংক্ষিপ্ত এক কাঠ-খোট্টা কণ্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকে। বেনহামের কন্ঠ।

ঘরে প্রবেশ করল এলিসা গ্রেস।

আগের মতই ঘরের মাঝাখানে গিয়ে দাঁড়াল। বসার চিন্তা আজ আর করল না সে। সৌজন্য বোধহীন অভদ্র লোকটা বসতে বলবে না।

মিনিট খানেক পরে বই থেকে মাথা তুলে বলল, ‘কেমন, সে এখন দরজা খুলে রাখে, তোমার হাত থেকে জিনিসও নেয় তাই না?’

‘জি, স্যার।’

‘হ্যাঁ, আমরা যা চাই, সবই তাকে করতে হবে।’

‘সেগুলো কি স্যার?’ প্রথম বারের মত আজ এলিসা গ্রেসের মনে কৌতূহল দেখা দিল জানতে যে, ওমর বায়াকে নিয়ে তারা কি করতে চায়।

‘সবই জানতে পারবে, সব তো তোমাকেই করতে হবে। এখন তোমার প্রয়োজন তাকে জয় করা।’

‘সে তো এখন কথা শুনছেই স্যার।’

‘না আমরা শুধু এতটুকু চাই না। তুমি যা বলবে তা সে অন্ধভাবে করবে, এ পর্যায়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে।’

‘সেটা কি সম্ভব স্যার? তাকে আমি একদম অন্য ধরণের মানুষ দেখছি।’

‘তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে যে সে আপনাতেই দরজা খুলে রাখবে, তোমার হাত থেকে ঐভাবে এত সহজেই জিনিস নিতে রাজি হবে?’

‘না স্যার, তা ভাবিনি। এখনও আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে এমনটা ঘটল।’

‘যেমন ভাবে ঘটেছে, তেমন ভাবেই সব ঘটবে। শুধু চাই, তুমি তাকে হাসি-খুশি রাখবে, তার মনকে ফ্রি রাখবে, যাতে কোন প্রকার নেতিবাচক কিছু তার মনে বাসা বাঁধতে না পারে।’

‘চেষ্টা করব স্যার।’

‘চেষ্টার জন্যে আমরা বেশি সময় দিতে পারব না। আমরা চাই তাড়াতাড়ি রেজাল্ট।’

‘কিন্তু কিভাবে?’

‘সেটাও কি বলে দিতে হবে? তোমার মত সুন্দরীকে কেন আনা হয়েছে তুমি জান।’

মাথা নিচু করল এলিসা গ্রেস। এক ঝলক রক্ত এসে জমা হলো তার চোখে মুখে। লজ্জা এবং অপমান দু’য়েরই প্রকাশ এতে আছে।

মাথা নিচু রেখেই বলল এলিসা, ‘জানি স্যার।’ কণ্ঠটা স্বাভাবিক রাখলেও এই কথা বলার সময় তার অন্তরটা কেঁপে উঠেছিল। কারও শয্যাসঙ্গী হওয়া তার জন্যে নতুন নয়। কিন্তু তার মাতৃধর্মের এবং তার হতভাগিনী নানীর প্রতিচ্ছবি ওমর বায়া ইতিমধ্যেই তার অন্তরের অনেক উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এমন লোকের সাথে প্রতারণা করা যায় না।

‘বেশ।’ বলল মি. বেনহাম। তারপর একটু থেমেই আবার শুরু করল, তোমার সাফল্য লাভের অর্থ তার মানসিক প্রতিরোধ ধসে পড়া। সে শুধু তোমাকে ভালোবাসবে না, বন্ধু ভাববে ব্ল্যাক ক্রসকে। এর পরের কাজটা আমাদের। তারপর তুমি যা বলবে সে তা করবে, এই আমরা চাই।’

কথা শেষ করেই মি. বেনহাম বই টেনে নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

এলিসা গ্রেস বুঝল এটাই কথা শেষ হওয়ার সংকেত এবং চলে যাবার নির্দেশও এটা।

এলিসা বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। পেছনে টেলিফোন বেজে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল মি. বেনহাম টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচ্ছে।

চলে আসার জন্যে আবার পা চালাল এলিসা গ্রেস। বেরিয়ে আসতে আসতে শুনল মি. বেনহামের কণ্ঠঃ 'হ্যালো, মি. পিয়েরে পল, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না, সুখবর আছে।'

সুখবর শোনার জন্যে হঠাৎ করেই কৌতুহল জাগলো এলিসার মনে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে দরজার সামনে দাঁড়াল এলিসা। বেশ পুরনো দরজা। ঢিলা ও আলগা হয়ে যাওয়ায় ভেতরের কথা বেশ শোনা যাচ্ছে।

শুনতে পেল বেনহামের কণ্ঠঃ 'আমাদের 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' এবং 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম' কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ওমর বায়ার ব্রেন আমাদের 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' ও 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম'-এর দু'টো ডিটেকশন গ্রহণ করেছে এবং কাজে পরিণত করেছে। সে দরজা বন্ধ করে রাখতো এখন রাখে না, আগে এলিসাকে এড়িয়ে চলতে চাইত, তার হাত থেকে কিছু নিত না, এখন নিতে শুরু করেছে। ... হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভ বিগিনিং। আমরা যতটা কঠিন মনে করেছিলাম, কাজটা ততটা কঠিন হবে না। আজ এলিসাকে যে নির্দেশ দিয়েছি তা হয়ে গেলে ওমর বায়ার মন ও মাথাকে সম্পূর্ণ ফ্রি পাব। সে মাথা ও মন দিয়ে আমাদের 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' এবং 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম' আমরা যা চাচ্ছি তা সহজেই করে ফেলবে। তবে এলিসা গ্রেসকে ওমর বায়ার সাথে ক্যামেরুন পর্যন্ত নিতে হবে।'

এলিসা গ্রেস আর দাঁড়াতে পারল না। মাথা ঘুরছে তার। ওদের টার্গেট কি, কি করতে চায় ওরা ওমর বায়াকে নিয়ে! 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' এবং 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম' কি? ওরা কি কোন অজানা অস্ত্র প্রয়োগ করছে ওমর বায়ার ওপর? এলিসা গ্রেস কি সে অস্ত্রের বাহন?

এলিসা গ্রেস তার ফ্ল্যাটে ফিরে ছুটে গেল তার নিজের কক্ষে। বুক সেলফ থেকে বের করল 'ইনসাইক্লোপেডিয়া অব সাইন্স'। বইটি নিয়ে বসল গিয়ে সোফায়।

বের করলো 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' এবং 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম' শব্দ দু'টি ইনসাইক্লোপেডিয়া থেকে।

গোগ্রাসে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কালোছায়া নামল এলিসা গ্রেসের চোখে-মুখে। ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম এমন একটা কৌশল যা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিলিকন চিপ ব্যবহার করে অনেক দূর থেকে একজন মানুষের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি পরিবর্তন করে তার মাথায় ইচ্ছামত ধারণা ও চিন্তা প্রবিষ্ট করা যায়। ইলেক্ট্র মিয়োগ্রামও অনুরূপ একটি অস্ত্র যা ব্যবহার করে মানুষের চোখে দর্শন-ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে কোন বিশেষ চিন্তা বা কাজের জন্যে তার মন ও মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করা যায়।

এলিসা গ্রেস বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিল সোফার ওপর। বুকটা কাঁপছে তার। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ব্ল্যাক ক্রস এক জটিল বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওমর বায়ার মন ও মস্তিষ্ককে পরিবর্তন করছে। ইতিমধ্যেই কিছুটা করে ফেলেছে তারা। এখন সে বুঝতে পারছে, বেনহাম কেমন করে দিনক্ষণসহ অমন ভবিষ্যত বাণী করতে পেরেছিল। আসলে ওটা ছিল 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' ও 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম'-এর কাজ।

শিউরে উঠল এলিসা গ্রেস। ব্ল্যাক ক্রসের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে দেহের দিক থেকে ওমর বায়া ঠিকই থাকবে, কিন্তু মন-মানসিকতার দিক দিয়ে সে হয়ে যাবে ভিন্ন মানুষ। আর এই জঘন্য কাজে এলিসা গ্রেস মূল্যবান বাহন হিসেবে কাজ করছে। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ওমর বায়ার মনকে প্রফুল্য ও ফ্রি রাখার প্রয়োজন পড়েছে এজন্যে যে যাতে তার মন ও মস্তিষ্ক ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আসা অনুপ্রবেশকারী চিন্তা ও ধারণার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারবে না।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সোফায় গা এলিয়ে দিল এলিসা গ্রেস। মন তার বিদ্রোহ করে উঠল, না সে ওমর বায়ার এত বড় সর্বনাশ হতে দিতে পারে না। হৃদয়ের কোথায় যেন ওমর বায়ার জন্যে তীব্র এক বেদনা অনুভব করল সে।

কিন্তু কি করবে সে? কি করে রক্ষা করবে তাকে? ব্ল্যাক ক্রস যা চায় তাই করে। তার হাত থেকে কেউ রক্ষা পেয়েছে বলে সে জানে না। ব্ল্যাক ক্রসের বিরুদ্ধে টু-শব্দ করার সাহসও কারও নেই। এলিসা তো দুর্বল মেয়ে মানুষ। তার ওপর সে এখানে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়ার ব্যাপারে যা করতে বলে তাই

করার। এক পা এদিক-সেদিক করলে তার নিজের জীবনই বিপন্ন হবে। ব্ল্যাক ক্রসের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। ভাবতে গিয়ে হৃদয়টা কেঁপে উঠল এলিসার।

ঘরে ঢুকল একজন পরিচারিকা। বলল, 'ম্যাডাম, সাহেবের নাস্তা রেডি।'

'যাও আসছি।' বলল এলিসা গ্রেস।

চলে গেল পরিচারিকা।

এলিসা গ্রেস সোজা হয়ে বসল সোফায়। তার মনে হলো, যে নাস্তা সে নিয়ে যাবে তা তো নাস্তা নয়। ভালো খাবার, সুন্দর পরিবেশ এবং সুন্দর নারীর ভোগ দিয়ে ওমর বায়ার ওরা সর্বনাশ করছে।

তবু নাস্তা তাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু অভিনয়ের প্রবৃত্তি আর যে তার হচ্ছে না। মন বলছে সত্য কথাটা ওমর বায়াকে বলা উচিত। কিন্তু কিভাবে বলবে? ও ঘরে এ ব্যাপারে টু শব্দও করা যাবে না। নিশ্চয় শব্দ ট্রান্সমিটার বসানো আছে। ওখানকার প্রতিটি কথা চলে যায় বেনহামের কাছে। ওখানে এলিসাকে অভিনয়ের কথাই বলকে হবে। ওমর বায়াকে ঘরের বাইরে অন্য কোথাও সব কথা বলতে হবে। একথা চিন্তা করতে গিয়েও আবার ভয় হলো এলিসা গ্রেসের। আসল ঘটনা জানার পর যদি ওমর বায়ার কথায় বা কাজে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহলে তার এবং ওমর বায়ার দু'জনেরই বিপদ হবে।

তাহলে কি করবে সে?

হঠাৎ এলিসার মাথায় বুদ্ধি এল, ওমর বায়াকে সব কথা না বলে এলিসা সম্পর্কেই ওমর বায়াকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলতে হবে, তাহলেই তার মধ্যে ভয় ও সন্দেহ দানা বাঁধবে এবং সৃষ্টি হবে তার মধ্যে একটা সতর্ক মনোভাব যা তার জন্যে একটা প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু পরক্ষণেই এলিসা আবার ভাবল, ওমর বায়া তাকে ভুল বুঝলে সে সহ্য করবে কেমন করে। সমগ্র অন্তর দিয়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে যার সে ভালো চায়, তাঁর ঘৃণা নিয়ে সে বাঁচবে কেমন করে? প্রেম এলিসা অনেকের সাথেই করেছে, ভেঙেছেও। কিন্তু এলিসা কাউকে তার হৃদয় দেয়নি, সুতরাং হৃদয় ভাঙার বেদনাও তার নেই। আজ অভিনয় করতে এসে, তার এই মূহুর্তে মনে হচ্ছে, সেই হৃদয়টাই সে হারিয়ে ফেলেছে তার

মাতৃধর্মের কালো যুবক ওমর বায়ার মধ্যে। এই হৃদয়টাকে সে আজ ভাঙবে কেমন করে? তাছাড়া ওমর বায়া তাকে সন্দেহ করলে বেনহামের নির্দেশ সে পালন করবে কেমন করে? সন্দেহ নিয়ে ওমর বায়া তার শয্যাসঙ্গী হতে চাইবে না!

কিন্তু এলিসা গ্রেস আর কোন বিকল্প পেল না। পরোক্ষভাবে এলিসা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করাই ওমর বায়াকে রক্ষার সবচেয়ে নিরাপদ পথ। উঠল এলিসা গ্রেস।

বেরুল ঘর থেকে ওমর বায়ার কাছে নাস্তা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ঠিক করল নাস্তা দেয়ার সময় অভিনয়ের সময়েই সে ওমর বায়াকে আমন্ত্রণ করবে ঘরের বাইরে এক সাথে বেড়ানোর। এ প্রস্তাব ওমর বায়া নিশ্চয় গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বেনহামও এতে খুশি হবে যে, আমি ওমর বায়াকে আরও কাছে আনার চেষ্টা করছি।

সেদিনই সন্ধ্যার পর। এলিসা ও ওমর বায়া পাশাপাশি হাঁটছিল আবছা আবছা আলো-আঁধারীর মধ্যে, সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এলিসা গ্রেস ওমর বায়াকে লক্ষ্য করে বলল, 'একটা কথা বলি?'

'কথা তো বলছেনই। আবার কি কথা? বলুন।'

'আপনি খুব সরল।'

'কেমন?'

'চিন্তা-ভাবনা না করেই সবাইকে আপনি বিশ্বাস করেন।'

'এ কথার অর্থ?'

'আমি যা বলি তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ, আপনি বললে করি।'

'কিন্তু আমার কথা আমার নয়, একথা আপনার জানা উচিত। আমি তো অন্যের পুতুল।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।' বলে চুপ করল ওমর বায়া।

এলিসা গ্রেসও নীরব। সে কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। সে বুঝতে পারল, ওমর বায়া তার কথা বুঝতে পেরেছে এবং গ্রহণও করেছে। অর্থাৎ এখন

ওমর বায়ার কাছে এলিসা গ্রেসের কানাকড়িও মূল্য নেই। মনটা এলিসার হু হু করে কেঁদে উঠতে চাইল।

কিছুক্ষণ পর কথা বলল ওমর বায়াই, 'ওরা পুতুল নাচিয়ে কি করতে চায়?'

ওমর বায়ার 'পুতুল' শব্দ উচ্চারণ ভীষণ খোঁচা দিল এলিসা গ্রেসের হৃদয়ে। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'পুতুল তো নাচার জন্যে। যারা নাচায় তাদের কথা সে বলবে কেমন করে?' কথাগুলো এলিসার গলায় আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু এই মিথ্যাগুলো না বলে তার তো উপায় নেই।

'ঠিক বলেছেন।'

ফিরছিল তারা ঘরের দিকে।

ঘরের ছায়ায় অন্ধকারটা একটু গাঢ়। এলিসা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ওমর বায়ার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনি আমার কথাগুলো হালকাভাবে নেননি তো? বিশ্বাস করেছেন তো?' একটা অবরুদ্ধ আবেগ ভেঙ্গে পড়তে চাইল এলিসার কন্ঠে।

'বলেছি তো আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু আমার সব কথা তো আমার কথা নয়।'

'সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার প্রতি বিশ্বাস আমার বেড়েছে।'

'কেন?'

'কারণ, কোন পুতুল যখন স্বেচ্ছায় প্রকাশ করে সে কারো পুতুল, তখন সে আর পুতুল থাকে না। আপনি আমার কাছে পুতুল নন।'

'এমনভাবে বলবেন না। সইতে পারব না আমি। আমি সত্যিই অসহায় এক পুতুল।'

বলে ওমর বায়ার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে দৌড় দিল করিডোরের দিকে।

করিডোর পেরিয়ে সে এসে প্রবেশ করল নিজের ঘরে। নিজেকে ছুঁড়ে দিল সে বিছানায়। বালিশে মুখ গুজল সে। হৃদয় ছাপিয়ে কান্না আসছে তার। সে

যা চেয়েছিল তা হলো না। ওমর বায়া তাকে ঘৃণা করে, সন্দেহ করে দূরে সরিয়ে দিল না। কেন দিল না? এলিসা গ্রেস পাপে ভরা একটা খোলস। ওমর বায়ার মত মাতৃধর্মের মহান লোকদের তার দেবার কিছু নেই। সে ঘৃণা করলে, সন্দেহ করলে দায়িত্বের ভার থেকে কিছুটা বাঁচত সে। এখন সে কি করবে? কি করার ক্ষমতা আছে তার?

টেলিফোন বেজে উঠল।

উঠে, চোখ মুছে ধরল টেলিফোন এলিসা গ্রেস।

'হ্যালো, এলিসা। কনগ্রাচুলেশন।'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'তুমি ওমর বায়াকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলে শুনলাম।'

'জ্বি স্যার।'

'ওয়েলকাম এলিসা। তুমি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।'

'চেষ্টা করছি স্যার।' খুব কষ্ট করেই উচ্চারণ করল শব্দ দু'টি এলিসা।

'তুমি সফল হবে। তোমার মত মেয়ে সফল হবার জন্যেই।' বেনহামের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ওপার থেকে কট করে শব্দ হলো। টেলিফোন রেখে দিয়েছে বেনহাম।

এলিসা গ্রেস টেলিফোন রাখল।

টেলিফোন রেখেই দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। অস্ফুট কন্ঠে বলল, 'সফলতা, ওটা সফলতা! ওটা সফলতা হলে আমার মৃত্যু কোনটা হবে!'

বলতে বলতে শ্লথ পা দু'টি টেনে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

তার মনে হলো চারদিক অন্ধকার।

আলো নেই, পথ নেই কোথাও।

মনে পড়ল ছোটবেলার কথা।

মা বলতেন, তাঁদের আল্লাহ এক এবং সর্বশক্তিমান।

মাতৃধর্মের সেই আল্লাহ কি আসবেন এলিসাকে সাহায্য করতে, তার জন্যে না হলেও অন্তত ওমর বায়ার স্বার্থে!

৫

ডোনার আব্বার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল আহমদ মুসা। দেখল তার ছোট ব্যাগটা কোলে নিয়ে তাতে মুখ গুঁজে বসে আছে ডোনা।

সেদিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'ব্যাগটাকে পণবন্দী করেছ বুঝি?'

ডোনা কোন কথা বলল না। মাথাও তুলল না।

আহমদ মুসা গিয়ে বসল।

'ব্যাগ বেশ মোটা লাগছে। এত কি ভরেছ ব্যাগে?' বলল আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ডোনা। বলল, 'আমার ব্যাগ ভরার পর যা বাকি থেকেছে এখানে তুলেছি।' গম্ভীর কন্ঠে বলল ডোনা।

'এর অর্থ?'

'অর্থ পরিষ্কার। আমি যাচ্ছি পেরেজ গিরেক অথবা সেন্ট পোল ডে লিউন এ।'

'তারপর?'

'তারপর, আমার সাথে যাচ্ছে কেয়ারটেকার হিসেবে পরিচারিকা নেকা টুগোনা।'

'বিষয়টা নিয়ে তুমি কি গভীরভাবে চিন্তা করেছ?'

'গত ক'ঘন্টা ধরে করেছি।'

'না করনি, তোমার বিবেচনার প্রতি আমার আস্থা আছে।'

'অনাস্থা সৃষ্টি হওয়ার মত কিছু করেছি?'

'করনি, কিন্তু বলছ।'

'যাওয়ার মধ্যে কি দোষ দেখছ তুমি?'

'ওটা যুদ্ধ ক্ষেত্র। আমি তোমাকে সেখানে নেব না।'

'যুদ্ধ ক্ষেত্র কি মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ?'

‘নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।’

‘এ দুর্ভাগ্য আমার হল কি করে? আমি এটা মেনে নেব কেন?’

‘দুর্ভাগ্য তোমার নয়, আমার।’ একটা দীর্ঘ নি:শ্বাস বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বুক থেকে।

ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ডোনার মুখ-চোখ থেকে জেদের ভাবটা উঠে গিয়ে সেখানে মমতার ছাপ ফুটে উঠল।

ডোনা নীরবে কিছুক্ষণ আহমদ মুসার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল এক সময়, ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে?’

‘কর।’

‘সেদিন তোমাকে ফলো করে ব্ল্যাক ক্রসের আড্ডায় গিয়েছিলাম তোমার বিনা অনুমতিতে। তুমি ওটা পছন্দ করনি ঠিক আছে। কিন্তু ফাতমাদের ওখানে যখন দ্বিতীয় পিস্তলটি বের করেছিলাম মোজার ভেতর থেকে, তখন তোমার চোখে-মুখে আমি কষ্ট লক্ষ্য করেছি। কেন এমন কষ্ট পেয়েছিলে তুমি?’

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তার মুখটি গম্ভীর হয়ে উঠল। তাতে একটা বেদনার ছায়াও পড়ল। মুখ নিচু করেছিল আহমদ মুসা।

ডোনা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

‘আমি তোমার হাতে পিস্তল দেখতে চাই না ডোনা।’ বেশ সময় নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

ডোনার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, ‘কেন, যে পিস্তলকে তুমি জীবনের সাথী বানিয়েছ, তা আমার হাতে থাকবে না কেন?’

‘পিস্তলকে আমি সাথী বানাইনি। পিস্তল আমার আত্মরক্ষার একটা উপকরণ মাত্র।’

‘কথা একই হল না?’

‘না। পিস্তল আমার সাথী বা লক্ষ্য নয়, পিস্তল আমার লক্ষ্য অর্জনের দুঃখজনক উপকরণ, যার দ্বারা মানুষ আহত হয়, নিহত হয়। রক্তপায়ী এ উপকরণ

আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই, কিন্তু পারছি না, পরিবেশ পরিস্থিতি তা পারতে দিচ্ছে না।'

'আমার হাতের পিস্তলকেও তুমি ঐভাবে দেখতে পার।'

'না, আমি তা দেখতে চাই না।'

'কিন্তু কেন?'

আহমদ মুসা মুখ নিচু করে কথা বলছিল। মুখ তুলে সে তাকাল ডোনার দিকে। তার শুন্য দৃষ্টিতে গভীর বেদনার ছাপ।

ডোনাও তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

চার চোখের মিলন হলো।

আহমদ মুসা চোখ নামিয়ে নিল। ধীর কণ্ঠে বলল, 'কারণ আমিনার যা ঘটেছে, তোমার ক্ষেত্রে তা ঘটতে দিতে চাই না।' আহমদ মুসার ভারী কণ্ঠ কেঁপে উঠল বলার সময়।

সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জাবতী লতার মতই চোখ দু'টি ডোনার নিচে নেমে গেল, মাথা নুয়ে পড়ল তার। সুখময় এক প্রবল যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল ডোনার হৃদয়ে, তার দেহের প্রতিটি কোষে, তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে। এমন একটি কথা শোনার জন্যে কত যে মাস, দিন, প্রহর সে গুণেছে! সে ভাবে নি, আশাও করে নি যে, আমিনার পাশাপাশি দাঁড়াবার সৌভাগ্য তার হবে। কৃতজ্ঞতায় মন তার ভরে গেল। চোখ দু'টি তার সিক্ত হয়ে উঠল আনন্দের অশ্রুতে।

অনেক্ষণ কথা বলতে পারল না ডোনা। মাথা তুলতে পারছিল না সে।

মাথা না তুলেই ডোনা বলল, 'আমিনা আপা পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছিলেন?' সিক্ত কণ্ঠস্বর ডোনার।

'তোমার মত করে নয়। দু'তিনবার পিস্তল ব্যবহার করেছে নিছক আত্মরক্ষার জন্যে।'

'কিন্তু তার পরেও তো মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যায় নি।'

'যায়নি। কারণ সে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। আমার শত্রুর টার্গেট হয়ে পড়েছিল সে। আমার কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল তার ওপর।'

'এমন ঘটনা কি ভবিষ্যতে এড়ানোর উপায় আছে?'

'জানি না। কিন্তু শত্রুর সামনে কোন সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যেই আমার ঘটনার সাথে নিজেকে অনেকখানি জড়িয়েছ। আর নয়।'

'তোমার ঘটনা কি আমার ঘটনা নয়?'

'তোমার ঘটনা অবশ্যই। কিন্তু সে ঘটনার সাথে তোমার জড়ানোর প্রয়োজন নেই।'

'এটা বাস্তব নয়।'

'একেবারে অবাস্তবও নয়। তবে ইসলামের সোনালী যুগের খলিফাগণ এবং সেনানীদের স্ত্রীরা সব সময় তাঁদের সহযাত্রী ছিলেন না।'

'কোন সময়ই ছিলেন না তা নয়। স্বামীর বিপদ দেখে, স্বামীর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেও তাঁদের স্ত্রীরা বাড়িতে চুপ করে বসেছিলেন, এমন নজীর আছে কী?'

'ঐ ধরণের বিপদ মোকাবিলা এবং প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা সব সময় থাকতো, সুতরাং স্ত্রীদের এ নিয়ে মাথা ব্যথার প্রয়োজন হয়নি।'

'কিন্তু আমার সেনাপতির তো সে ব্যবস্থা নেই।'

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'আমি ফ্রান্সের মুসলিম দূতাবাসগুলোর সাথে কথা বলেছি। তারা ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখবে। তাছাড়া সাইমুমের ইউনিট আশে-পাশেই থাকবে। ডাকলেই পাব তাদের।'

'তোমার এ কথাগুলো সান্ত্বনার জন্যে ভালো, কিন্তু কাজের কথা নয়। অভিযানের সঙ্গী হওয়া এক কথা, আর ডাকলেই পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।'

'তুমি বুঝছ না ডোনা। অভিযানে গেলে দলবল নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমি অভিযানে যাচ্ছি না। আবার জয়ের শর্ত যদি শক্তি হয়, তাহলেও দল ভারী করে যেতে হয়। কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বুদ্ধির যুদ্ধে জিততে হবে। ফ্রান্সে ব্ল্যাক ক্রসের রাজধানীতে শক্তি নিয়ে অগ্রসর হলে ওদের সাথে পারা যাবে না। সুতরাং বুদ্ধির যুদ্ধেই ওদের পরাজিত করতে হবে। এজন্যেই আমি একা যাচ্ছি। শক্তির প্রয়োজন যদি পড়েই, তাহলে যথাসময়ে যাতে তাদের পাই সে ব্যবস্থাও থাকবে।'

থামল আহমদ মুসা।

ডোনা কিছু বলল না। মুখ নিচু করে রইল।

একটু পর মুখ না তুলেই বলল, 'ঠিক আছে, অভিযানের শরীক হলাম না। তোমার সাথেও গেলাম না। পেরেজ গিরেক এবং সেন্ট পোল ডে লিউন-এ বেড়াতেও তো যেতে পারি!'

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'আজ আমাকে ফলো করেছিলে সে তো কিছুটা কৌতুহল, কিছুটা বেড়াবার ছলেই। কিন্তু ঘটনা কি হয়েছিল? যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলে তুমি।'

'আমি মনে করি, আল্লাহই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর প্রয়োজন ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে।'

আহমদ মুসা একটু ঘুরে মুখোমুখি হল ডোনার। গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ। ধীর এবং নরম করণ্ঠ বলল, 'তুমি বুরবো রাজকুমারী মারিয়া জোসেফাইন লুই। ফ্রান্স শাসনকারী রাজরক্ত তোমার শরীরে। তোমার শক্তি, সাহস, বুদ্ধি সবই আছে। তোমার সাহায্য আমার জন্যে মূল্যবান হবে। কিন্তু আমি যে ভিন্নভাবে পেতে চাই তোমাকে। আমিনা আমাকে বিরাট শিক্ষা দিয়ে গেছে। তার বিদায়ের দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না। আমি কিছুতেই তোমাকে তার পরিণতির দিকে যেতে দেব না। মেনে নিতে পারবে না এটা? আহমদ মুসার নরম কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত মনে হলো।

ডোনার মাথা নুয়ে পড়েছে।

বলল, 'পারব। কিন্তু বাইরে যখন তুমি জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন ঘরে আমার প্রতিটি মুহুর্ত হবে যন্ত্রণার।' কান্নায় জড়িয়ে পড়ল ডোনার কথা। আহমদ মুসা হাত তুলল ডোনার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। কিন্তু কেঁপে উঠল তার হাত। এই ভাবে ডোনাকে স্পর্শ করার অধিকার তার আসে নি। হাত সরিয়ে নিল সে। বলল, 'আমি জানি ডোনা। আমি আমার অন্তর চোখে তোমার এই রূপ দেখতে পাব এবং এটা হবে আমার জন্যে শক্তি, সাহস ও প্রেরণার একটি উৎস।'

'ধন্যবাদ' বলে ডোনা মুখ তুলল। রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, 'কিন্তু একটা অধিকার আমি চাই।'

‘কি সেটা?’

‘যদি তিন দিন তুমি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমার সাথে যোগাযোগ না কর কোন পূর্ব ইনফরমেশন ছাড়া, তাহলে আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারব।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এ অধিকার তোমাকে দিলাম। খুশি?’

হাসল ডোনা। বলল, ‘খুশি। তোমাকে আমিও একটা খুশির খবর দিতে পারি।’

‘কি?’

‘আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।’

‘কবে? কখন?’ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

‘আজ তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে। আব্বার সাথে প্যারিস মসজিদে গিয়েছিলাম। আগেই যোগাযোগ করে রেখেছিলেন আব্বা।’

‘বা’রে! আমাকে বলনি?’

‘হ্যাঁ, তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাই, আর লোকে বলুক যে, তোমাকে বিয়ে করার জন্যেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমাকে ভালবেসে নয়, ইসলামকে ভালবেসেই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এটুকু বলতে পার যে, তোমাকে ভালবেসে আমি ইসলামকে ভালবাসার সুযোগ পেয়েছি।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আমি তোমার কাছে এটাই চেয়েছিলাম ডোনা।’

‘আর কিছু চাওনি?’

‘ঠিক চাওয়া নয়, ভেবেছিলাম। প্রায় ৬শ’ বছর আগে সার্বিয়ার রাজা স্টিফেনের বোন লেডি ডেসপিনা ইসলাম গ্রহণ করে গোটা বলকান অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তেমনি ফ্রান্সের বুরবো রাজকুমারীও পারবেন ফ্রান্স এবং এই পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে।’

একটা আবেগের স্ফুরণ ঘটল ডোনার চোখে-মুখে। তার কোলে রাখা আহমদ মুসার ব্যাগটার ওপর মাথা রেখে বলল, ‘ভাবনাটা কি খুব বেশি দূর গড়াল না? লেডি ডেসপিনার ছিল রাজদণ্ড, কিন্তু তোমার কথিত বুরবো রাজকুমারী ফ্রান্সের সব হারানো এক নাগরিক মাত্র।’

‘বুরবো রাজকুমারীর রাজ্য নেই, রাজদণ্ড নেই সত্য, কিন্তু আমি দেখেছি ফরাসীদের হৃদয় জুড়ে তার একটি সাম্রাজ্য আছে। সে সাম্রাজ্য সম্মান এবং ভালোবাসার। রাজদণ্ডের চেয়ে সম্মান এবং ভালোবাসার শক্তিই বেশি কার্যকর।’

একটা ভাবাবেগ এবং লজ্জার প্লাবন ডোনার মুখ ভারী করে তুলেছে। ব্যাগের ওপর রাখা মুখ তুলে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল। বলল, ‘তুমি এমনভাবে কথা বল, তাতে মনে হয় আমি আমাকে নতুন করে দেখছি। সেই আমি যেন আমার কাছেও অপরিচিত। আসলে তুমি অনেক বড়, হৃদয়টা তোমার আকাশের মত বিশাল। তাই এমন বড় করে দেখতে পার।’

‘না। যে ‘তুমি’-কে তোমার অপরিচিত মনে হয়, সেটাই আসল ‘তুমি’। সেই আসল ‘তুমি’ই পারবে এক দুই তিন করে ফ্রান্সকে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত করতে।’

ডোনা কোলের ব্যাগটা সোফায় রেখে ঝুপ করে গিয়ে কার্পেটের ওপর আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসল। বলল, ‘সত্যি বলছ আমি পারব? পারব লেডি ডেসপিনার মত কিছু করতে?’

‘অবশ্যই পারবে। কিন্তু পিস্তল ছেড়ে দিয়ে হাতে তুলে নিতে হবে কলম ও বই এবং মুখে তুলে নিতে হবে মনোহরা বক্তৃতা। ফ্রান্সের মানুষ তোমর হাতে পিস্তল নয় এসব দেখলেই খুশি হবে।’

‘তোমার কথা মানলাম। ইসলামেরও পথ এটাই। কিন্তু আমার পিস্তলের প্রতি তোমার এই বিদ্বেষ কি ভালো, বিশেষ করে তোমার জন্যে তুমি পিস্তলকে যখন এতই ভালবাস?’

পিস্তলকে আমি ভালোবাসি না। কিন্তু ভালোবাসি আমার আত্মরক্ষার পিস্তলকে। তোমার আত্মরক্ষার পিস্তলও আমার প্রিয়।’

হাসল ডোনা। বলল, ‘তোমার আত্মরক্ষার পিস্তল নিয়ে তুমি পেরেজ গিরেক অথবা সেন্ট পোল ডে লিউন-এ যেতে পার, কিন্তু আমি আমার আত্মরক্ষার পিস্তল নিয়ে যেতে পারছি না। তাহলে এই দুই পিস্তলের মধ্যে পার্থক্য কি?’

‘পার্থক্য কর্মক্ষেত্র ও কর্ম প্রকৃতির। আমি করছি জালেমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আর তোমার সংগ্রামের পথ ইতিবাচক, যে পথে চলছে ‘ইয়ুথ সোসাইটি অব ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ।’ এক্ষেত্রেও ব্যক্তি পর্যায়ে আত্মরক্ষার পিস্তলের প্রয়োজন হতে পারে।’

‘অর্থাৎ আমার মিশনারীর পথ।’ মুখ টিপে হেসে বলল ডোনা।

‘তোমার বোধ হয় পছন্দ নয়?’ আহমদ মুসাও হাসল মুখ টিপে।

‘পছন্দ হবে না কেন? ইসলাম তো মিশনারী ধর্ম। পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিস্তার তো মিশনারীদের দ্বারাই।’

‘ধন্যবাদ। তুমি তো সবই জান।’

থেমেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘ডোনা এখন উঠি।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডোনাও। তার মুখ ভারী হয়ে উঠেছে।

নেমে এল তারা গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা ডোনার হাত থেকে ব্যাগ নিতে চাইল। ডোনা দিল না। সে নিজে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে ব্যাগটি রাখল। তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে এস দাঁড়াল আহমদ মুসার পাশে।

‘তোমার জিনিসপত্র বের করে নিয়েছ তো ব্যাগ থেকে?’ হাসতে চেষ্টা করে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা কথা বলল না। মাথা নেড়ে জানাল নিয়েছে।

‘কথা বলছ না যে?’ গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা চোখ তুলে চাইল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘মনে থাকে যেন তিন দিন তুমি নীরব থাকলে চতুর্থ দিন আমি হাজির হবো।’

‘ইনশাআল্লাহ তার দরকার হবে না ডোনা।’

‘আবার বলছি তুমি নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান নও। তাই তো বলছিলাম.......।’

আহমদ মুসা হাতের কোটটা স্টেয়ারিং হুইলের উপর রেখে ফিরে দাঁড়াল ডোনার দিকে। বলল, 'তোমার এ কথায় আমিনার একটা কথা মনে পড়ল। আমি সিংকিয়াং-এ যেদিন একটা অভিযানে বেরুচ্ছিলাম। এমনি আশংকা করে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দেখার জন্যে মা-চু নামে একজনকে সাথে দিয়েছিল।'

'আপা পেরেছিলেন, কিন্তু আমি পারলাম না।'

'তোমার আপা পেরেছিলেন, কারণ সে অভিযানে আমার সাথে আরও অনেকে ছিল। তাদের সাথে মা-চু'ও শামিল হয়েছিল। আর দেখ, আমিনার মা-চু যেমন আমার সাথে ছিল, আজ তেমনি তোমার গাড়ি আমার সাথে থাকছে। বলে হাসল আহমদ মুসা। তারপর সালাম দিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার কথার ভংগিতে ডোনাও হাসি বোধ করতে পারেনি। সে হেসে গাড়ির জানালায় মুখ এনে বলল, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ফি আমানিল্লাহ।'

গাড়ি স্টার্ট নিল আহমদ মুসার।

বেরিয়ে গেল ডোনাদের বিশাল গেট দিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল ডোনা। তার মনে হচ্ছে, তার সব শক্তি, সব হাসি-আনন্দ যেন ঐ গাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

পেছন থেকে ধীরে ধীরে এস ডোনার আব্বা হাত রাখল ডোনার কাঁধে।

ডোনা মুখ ফিরিয়ে তার আব্বাকে দেখে তার কাঁধে মুখ গুজল।

ডোনার আব্বা ডোনার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'বুরবো মেয়েরা তাদের আপনজনদের যুদ্ধে বিদায় দিতে কখনো কাঁদে না মা।'

'কিন্তু ও অত্যন্ত বেপরোয়া আব্বা।' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল ডোনা।

'মুসলমানরা যখন যুদ্ধে নামে, তখন তাদের সামনে দু'টি লক্ষ্য থাকে; গাজী হওয়া অথবা শহীদ হওয়া। সুতরাং বেপরোয়া তারা হতেই পারে। এটা তাদের দোষ নয়, গুণ।'

বলে ডোনার আব্বা যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

ডোনাও ফিরল তার আব্বার সাথে।

ওদিকে প্যারিস পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলছিল।

প্যারিস থেকে বেরিয়ে যে হাইওয়েটি লা-ম্যান, রেনে ও মোরলেন্স হয়ে সেন্ট পোল ডে লিউন-এ পৌঁছেছে সেই হাইওয়ে বেছে নিয়েছে আহমদ মুসা সেন্ট পোল ডে লিউন-এ যাবার জন্যে।

আহমদ মুসা প্রথমে সেন্ট পোল ডে লিউন-এ যাওয়াই ঠিক করেছে। তার বিশ্বাস পেরেজ গিরেক-এর সেন্ট অসাস্টাস নয়, ডে লিউন এর শার্লেম্যান গীর্জায় ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার হওয়া সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত। শার্লেম্যান ইউরোপে একক একটি খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ব্ল্যাক ক্রসও এই লক্ষেরই একটি অস্ত্র। তবে এখন লক্ষ্যটা শুধু ইউরোপ নয়, গোটা বিশ্ব।

তৃষ্ণা পেল আহমদ মুসার।

রাস্তার পাশে একটা পার্কিং দেখে গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা। পাশের সিট থেকে ব্যাগ টেনে নিল ওর ভেতর থেকে ফলের জুস বের করার জন্যে।

ব্যাগ খুলতেই আহমদ মুসার চোখে পড়ল রেশমি কাপড়ের একটা থলে। এ থলে আহমদ মুসার নয়। হাতে তুলে নিল সে। একটা সেন্ট পেল থলের ভেতর থেকে। এ সেন্ট ডোনা ব্যবহার করে থাকে। আহমদ মুসা নি:সন্দেহ হলো থলেটা ডোনার। শেষ মূহুর্তে ওর জিনিসপত্র বের করে নেয়ার সময় এটা নিতে ভুলে গেছে নিশ্চয়।

থলের মুখটা চেন দিয়ে আটকানো।

থলেটা রেখে দিতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরে কাগজ আছে দেখে আহমদ মুসা থলের চেন খুলে ফেলল। ভেতরে দেখতে পেল দু'টো ফোল্ডার, একটা মানিব্যাগ এবং ভেলভেটের ক্ষুদ্র একটা বাক্স।

ফোল্ডার দু'টি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা দেখল, সেন্ট পোল ডে লিউন এবং পেরেজ গিরেক শহরের পর্যটন গাইড। এতে রাস্তা, হোটেল এবং পুরাতন ও

নতুন দর্শনীয় স্থানের লোকেশন, পরিচয় ইত্যাদি দেয়া আছে। খুশি হলো আহমদ মুসা দরকারি এ জিনিস পেয়ে। সে মনে করেছিল, শহরে গিয়ে সে এ গাইড যোগাড় করে নেবে। আহমদ মুসা ভাবল, ডোনা তার নিজের জন্যে এটা যোগাড় করেছিল।

মানিব্যাগটাও হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। মনে মনে একটু হাসল। দেখা যাক কত টাকা ডোনা সাথে নিচ্ছিল।

কিন্তু মানিব্যাগটার ভাঁজ খুলেই আহমদ মুসা দেখতে পেল মানিব্যাগের নেম-হোল্ডারের কার্ডটিতে আহমদ মুসার নাম লেখা। ডোনার হস্তাক্ষর, দেখেই চিনতে পারল আহমদ মুসা।

মানিব্যাগের পকেটে নজর বুলিয়ে দেখল, এক হাজার ফ্রাংকের নোটে মানিব্যাগের পকেট ঠাসা।

এবার আহমদ মুসা বুঝল রেশমী কাপড়ের এ থলেটা ডোনা তার জন্যেই রেখে গেছে এই ব্যাগে। কিন্তু ঐ ভেলভেটের বাক্সটা কেন? দামী ঐ বাক্সটা বুঝা যাচ্ছে দামী কোন অলঙ্কারের জন্যেই। ডোনার নিশ্চয়ই।

কি আছে ওতে ডোনার? খুলল আহমদ মুসা বাক্সটা। ছাই রংয়ের একটা আংটি বাক্সে। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল আংটিটা প্লাটিনামের। খুবই সাধারণ আংটিটা। বেশি দামী বা কম দামী কোন পাথর বসানো নেই।

'এমন একটা আংটি ডোনা কেন এনেছিল সাথে?' মনে মনে একথা বলতে বলতে আহমদ মুসা আংটিটা হাতে তুলে নিল। আংটির সাথে একটা স্লিপ বাঁধা। তাতেও আহমদ মুসার নাম লেখা।

স্লিপ পড়ার পর আহমদ মুসা সচেতন হলো। ডোনার মত সতর্ক ও দূরদর্শী কেউ বিনা কারণে এ ধরণের আংটি এভাবে রাখেতে পারে না।

উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল সে আংটিটাকে। হঠাৎ আহমদ মুসা আংটির টপে সূচের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম নীল মুখো একটা বিন্দু দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই মনটা নেচে উঠল আহমদ মুসার। ভয়ঙ্কর লেসার রিং এটা। রিং টপের নীল বিন্দুটির ওপর নির্দিষ্ট পরিমণ চাপ নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রয়োগ করলে ভয়ঙ্কর লেসার রে বেরিয়ে আসে। সে রে দিয়ে যে কোন জিনিস কাটা যায়, যে কোন

মেটাল গলিয়ে ফেলা যায়। আর মানুষের দেহে এই লেসার রে বুলেটের মতই কাজ করে।

বহুমূল্য দুর্লভ এই লেসার রিং। ডোনা তার জন্যে যোগাড় করেছে। হৃদয়টা ভরে গেল আহমদ মুসার অনির্বচনীয় এক প্রশান্তিতে। ডোনার বুদ্ধিদীপ্ত জেদি মুখটা ভেসে উঠল আহমদ মুসার চোখের সামনে। হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। ডোনা তাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে রিংটি এভাবে রেখে।

আংটিটি ডান হাতের মধ্যমায় পরাল আহমদ মুসা। একদম ঠিকমত লাগল আংটিটি মধ্যমায়। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। কখন ডোনা মাপ নিল তার মধ্যমার! এই আংটি একমাত্র মধ্যমাতেই পরতে হয়, একথা জানল কি করে সে!

থলেটির মুখে চেন এঁটে ব্যাগে রাখতে রাখতে আহমদ মুসা ভাবল, ডোনা সত্যিই প্রতিভাবান। একজন সংগ্রামীর সব বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে আছে।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল আহমদ মুসার মন। আল্লাহ ডোনাকে লেডি ডেসপিনার সৌভাগ্য দিন!

পানি খেয়ে গাড়ি রাস্তায় তুলে নিল আহমদ মুসা।

ছুটল তার গাড়ি আবার।

সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আহমদ মুসা শার্লেম্যান গীর্জার সামনে ঘুর ঘুর করছে এবং চোখ রাখছে গীর্জার গেটের দিকে।

গীর্জার পাশাপাশি দু'টি গেট। একটা সরাসরি গীর্জায় ঢোকার। অন্যটি মূল গীর্জা ভবনের দক্ষিণ দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে গেছে ভেতর দিকে।

দ্বিতীয় দরজাটিকে দরজা না বলে বিশাল গেট বলাই ভালো। বড় গাড়িও এ গেট দিয়ে চলাচল করতে পারে।

দু'দরজা দিয়েই সারাদিন লোক যাওয়া আসা করছে। তবে গীর্জার গেট দিয়ে বেশি, পাশের গেট দিয়ে অনেক কম। গীর্জার গেট দিয়ে যারা প্রবেশ করছে তারা ভক্ত শ্রেণীর লোক, দেখেই বুঝা যায়। আর পাশের গেট দিয়ে যারা প্রবেশ

করছে, তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের কাউকে ব্যবসায়ী, কাউকে অফিস কর্মচারী, কাউকে আবার সৈনিকের মত বেপরোয়া প্রকৃতির মনে হয়।

আহমদ মুসা গীর্জায় প্রবেশ করেছে গত দু'দিনে কয়েকবার। কিন্তু একদমই কিছু না জেনে হুট করে ঢুকে পড়াকে যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। গীর্জায় ব্ল্যাক ক্রসের অফিস মানে গীর্জার ভেতরে অবশ্যই নয়, গীর্জার কভার নিয়ে গীর্জা কমপ্লেক্সকে তারা অফিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে গীর্জার পুরো নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে থাকার কথা।

শার্লেম্যান গীর্জার এই কমপ্লেক্স কত বড়, সেখানে কি আছে, কারা থাকে, ইত্যাদি খবর পেলেই সে বুঝতে পারবে ব্ল্যাক ক্রস এখানে আছে কিনা।

চারদিক ঘুরে যতটুকু দেখেছে, তাতে চমৎকার লেগেছে সেন্ট পোল ডে লিউন শহরটাকে। আটলান্টিকের ওপর এ শহরটা ছবির মতই সুন্দর। বিশেষ করে শার্লেম্যান গীর্জার এদিকটা যেন সাগরের ওপর ভাসছে, অবিরাম নাচছে, যেন সাগর-ঢেউয়ের তালে তালে।

সবটা আহমদ মুসা দেখেনি। দেখলে আরও চমৎকৃত হতো। গীর্জার পশ্চিম প্রান্তটা যেন সাগরের বুক থেকে উঠে এসেছে। সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে গীর্জার দেয়ালে। এবং পশ্চিম প্রান্তে গীর্জার নিজস্ব একটি জেটিও রয়েছে। চার-পাঁচটা জাহাজ সেখানে নোঙ্গর করতে পারে। শুধু তাই নয় সে বিশাল জেটিতে ছোট প্লেন ও হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থাও রয়েছে। জেটিতে নিজস্ব সিগন্যাল বডিও রয়েছে। গীর্জার সাথে এই আয়োজন কিছুতেই মেলে না। আহমদ মুসা এসব দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি বলে লাফিয়ে উঠতো। কিন্তু গীর্জার এ পশ্চিম অংশ দেখার তার কোন সুযোগ নেই। সাগর পথে না এলে এদিকটা কিছুতেই দেখা যাবে না।

গীর্জা কমপ্লেক্সের গা ঘেঁষেই একটা রেস্টুরেন্ট দক্ষিণ দিকে। আহমদ মুসা গত দু'দিন এই রেস্টুরেন্টেই বেশি সময় কাটাচ্ছে। রেস্টুরেন্টের পূর্ব প্রান্তে জানালার ধারের টেবিলটায় বসলে গীর্জার দু'টো গেট দিয়ে সকলের যাওয়া-আসাই প্রত্যক্ষ করা যায়। গত দু'দিনের বড় একটা সময় আহমদ মুসা এখানে বসেই কাটিয়েছে।

রেস্টুরেন্টের ওয়েস্ট্রেসদের বিশেষ করে তার টেবিলের ওয়েট্রেস মেয়েটির দৃষ্টি সে ভালো করেই আকৃষ্ট করতে পেরেছে। আহমদ মুসা মদ খায় না এবং গোশত ও চর্বি জাতীয় কিছুই খায় না। এরকম খদ্দের ওয়েট্রেস মেয়েটি এই রেস্টুরেন্টে দেখেনি। এতে ওয়েট্রেস মেয়েটি বেজার নয়, খুশিই। খুশির কারণ, গোশতের বদলে যে মাছ ও সবজী আহমদ মুসা খায়, তার দাম গোশতের চেয়ে বেশি। আবার মদের বদলে যে মিনারেল ওয়াটার সে খায়, তারও দাম মদের চেয়ে কম নয়। তবে আহমদ মুসার ব্যবহারই ওয়েট্রেস মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। অন্য খদ্দেরদের চোখ এবং আহমদ মুসার চোখ সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য খদ্দেরদের চোখে যেখানে থাকে লালসা অথবা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাব, সেখানে আহমদ মুসার চোখে সে দেখে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টি। যখন সে কথা বলে তখন মনে হয় সে যেন বোন বা কোন সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কথা বলছে। এ বিস্ময়কর লোকটি রেস্টুরেন্টে এলে খুশিই হয় ওয়েট্রেস মেয়েটি। আরও খুশি এই কারণে যে, সে একই টেবিলে এবং তার সার্ভিস টেবিলেই সবসময় বসছে।

সেদিন বেলা ১১টা। বিরাট রেস্টুরেন্টে লোকজন নেই বললেই চলে।

আহমদ মুসা কফি খাচ্ছে এবং তাকিয়ে আছে গীর্জার সেই গেটের দিকে।

আহমদ মুসার টেবিলের ওয়েট্রেসটি এগিয়ে এল। এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার টেবিলের সামনে।

নিরেট ফরাসী তরুণী। তবে চুল কালো এবং চোখ কটা নয়। বয়স বিশ একুশ হবে। চেহারায় চটপটে ও সপ্রতিভ ভাব।

ওয়েট্রেস মেয়েটি এসে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

মেয়েটা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'বসতে পারি?'

'বসুন।' আহমদ মুসার চোখে কিছুটা বিস্ময় ভাব।

'আপনি বুঝি মুসলমান?' বসেই মেয়েটি অনুচ্চ কন্ঠে বলল।

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'আপনার খাদ্য তালিকা দেখে এবং ব্যবহার দেখে।'

'আপনি কি মুসলমানদের খাদ্য তালিকা চেনেন? মিশেছেন কখনও মুসলমানদের সাথে?'

‘মুসলমানদের খাদ্য তালিকা চিনি না এবং কোন মুসলমানের সাথেও মিশিনি। তবে আমার এক বান্ধবীর মা মুসলমান ছিলেন। বান্ধবীটির কাছেই সব শুনেছি।’

‘মুসলমানদের বুঝি খারাপ লাগে?’ ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘না, নাম শুনেই আমার ভালো লাগে। আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?’

‘কি করে বুঝলেন?’

‘কয়েক দিনে আমি বুঝেছি আপনি কাউকে খুঁজছেন। আপনার চোখ দু’টিকে সবসময় কিছু অনুসন্ধান করতে দেখছি। আপনি বুঝি নতুন এ শহরে?’

‘হ্যাঁ, ক’দিন আগে এসেছি।’

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল, ‘আমার এক বন্ধুকে খুঁজছি। সে আমাকে এই গীর্জার ঠিকানা দিয়েছিল। তার নাম-পরিচয় ভুলে গেছি। শুধু গীর্জার ঠিকানার কথাই মনে আছে। গীর্জায় ক’দিন ধরে ঘুরছি। কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।’

একটু হাসল মেয়েটি। বলল, ‘এভাবে বুঝি কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়?’

বলেই মেয়েটি একটু গম্ভীর হলো। বলল, ‘আপনার বন্ধু নিশ্চয় মুসলমান নয়?

‘কেন একথা বলছেন?’

‘বলছি এ কারণে যে, কোন মুসলমান এ গীর্জার ঠিকানা দিতে পারে না। এ গীর্জার আশ-পাশেও কোন মুসলমান থাকতে পারে না।’

মেয়েটির কথায় আহমদ মুসা রহস্যের গন্ধ পেল। বলল, ‘কেন পারে না?’ কৃত্রিম একটা বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল আহমদ মুসা তার চোখে।

‘বাইরের কেউ জানে না, শার্লেম্যান এখন নামমাত্র একটা গীর্জা। আসলে গোটাটাই ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার। এ রেস্টুরেন্টও তাদের নিয়ন্ত্রণে। চিনেন আপনি ব্ল্যাক ক্রসকে?’ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল মেয়েটি।

‘বলুন কে এরা?’না জানার ভান করে থাকল আহমদ মুসা।

‘ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান কে জানেন? সে রকমই একটা জঙ্গী সংগঠন। ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান দেখে শ্বেতাংগদের স্বার্থ, আর ব্ল্যাক ক্রস দেখে খৃস্টানদের স্বার্থÑ বৈধ-অবৈধ যাই হোক। এই কারণে ব্ল্যাক ক্রস প্রচণ্ডভাবে মুসলিম বিদ্বেষী।’

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলল, ‘ঐ যে ওদের একজন আসছে। সাংঘাতিক লোক। উঠি।’

বলে দ্রুত উঠে গেল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তাকাল রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে। দেখল একজন লোক রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করছে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। তাগড়া চেহারা। রুচিসম্মত পোশাকে তার দেহটা ঢাকা থাকলেও তার চেহারা থেকে অপরাধীর ছাপ মুছে যায়নি।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা, আর মনে মনে ধন্যবাদ দিল মেয়েটিকে। অযাচিতভাবে মেয়েটি যে মূল্যবান তথ্য দিয়ে গেল, যার জন্যে গত দু'দিন ধরে সে হাপিত্যেস করছে, তা আল্লাহরই এক বিশেষ দয়া। আর ব্ল্যাক ক্রসের এ লোকটিকে চিনিয়ে দেয়ায় তার অশেষ উপকার হয়েছে। সে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করছিল এমন একটি সুযোগের।

লোকটি বেশিক্ষণ বসল না। এক পেগ মদ খেয়েই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি তাকে সার্ভ করছিল তাকে ডাকল।

মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালে তাকে কি যেন বলল। মেয়েটি হাসল। তারপর লোকটি মেয়েটির গালে একটি টোকা দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কফির বিল আগেই শোধ করে দিয়েছিল সে।

লোকটি বেরিয়ে এলে আহমদ মুসাও বেরিয়ে এল।

লোকটি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে একটি কারে উঠল। চলতে শুরু করল তার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়িও দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে।

আহমদ মুসা লোকটিকে অনুসরণ করল।

ব্ল্যাক ক্রসের একজন লোককে আহমদ মুসার এখন খুব দরকার। ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারের সন্ধান সে পেয়েছে। এখন তার জানা দরকার ওমর বায়া এখানে আছে কিনা। নিছক লড়াইয়ে নেমে তার কোন লাভ নেই। ওমর বায়া আছে নিশ্চিত হলে তাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা তাকে নিতে হবে।

আগের গাড়িটা যে কার পার্কে গিয়ে দাঁড়াল, সেটা আহমদ মুসার চেনা। এর সামনের বাড়ির একটা ফ্ল্যাট সে ভাড়া নিয়েছে।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল তার ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া বাড়িতেই লোকটি প্রবেশ করল।

পেছনে পেছনে আহমদ মুসাও প্রবেশ করল বাড়িতে।

আহমদ মুসার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল যখন সে দেখল তিন তলায় তার ফ্ল্যাটের বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটেই লোকটি প্রবেশ করছে।

ফ্ল্যাটটি লক করা ছিল। চাবি দিয়ে খুলে লোকটি প্রবেশ করছে ফ্ল্যাটে।

আহমদ মুসা বুঝল, নিশ্চয় এই মুহুর্তে আর কেউ নেই ফ্ল্যাটে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। দেরি করলে ঝামেলা বাড়তে পারে।

পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারের স্পর্শ অনুভব করল। তারপর গিয়ে নক করল দরজায়।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দেখা গেল সেই লোকটিকে। লোকটি বাম হাতে খোলা দরজা ধরে আছে, ডান হাতে তার উদ্ধত রিভলবার।

আহমদ মুসার জন্যে দৃশ্যটা অভাবিত। এমনটি সে আশাই করেনি। নক করা দেখেই সম্ভবত বুঝেছিল তার কোন মিত্র আসেনি। সুতরাং সে প্রস্তুত হয়েই দরজা খুলেছে।

দরজা খুলেই লোকটি বলল, ‘কে তুমি, কি চাও?’

আহমদ মুসা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। একধাপ এগিয়ে বাম হাতটা দরজার চৌকাঠে রেখে হাসি মুখে বলল, ‘আমাকে চিনবেন না। এখানে নতুন ভাড়ায় এসেছি। কয়েকটা কথা বলতে চাই আপনাকে।’

সন্দেহ ও বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠা লোকটির মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ফেরেববাজীর কোন জায়গা পেলেন না। যান, এখান থেকে। না হলে...।'

লোকটি বুঝে ওঠার আগেই তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু লোকটি রিভলবার হারালেও অ™ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে আহমদ মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহমদ মুসাকে নিয়ে পড়ে গেল লোকটি।

লোকটি দু'হাতে আহমদ মুসার গলা চেপে ধরেছিল। পড়ে গিয়েও সে গলা ছাড়েনি।

আহমদ মুসা নিচে পড়ে গেলেও তার দেহের কোমর থেকে পেছন দিকটা বাইরে ছিল। সে এই পেছন দিকটা প্রচণ্ড বেগে ওপর দিকে ছুঁড়ে ধনুকের মত ডান পাশে নিয়ে এল। গতির প্রচণ্ড ধাক্কায় লোকটির দেহ উল্টে নিচে পড়ে গেল এবং আহমদ মুসার দেহ ওপরে উঠে এল। লোকটির হাত খুলে গেল আহমদ মুসার গলা থেকে।

আহমদ মুসা ওপরে উঠেই কারাত চালাল লোকটির কানের পাশে নরম জায়গাটায়। পর পর দু'বার।

কয়েক মুহুর্তের মধ্যে লোকটির দেহ নিস্তেজ হয়ে এল।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট না করে দ্রুত তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটির ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল।

এসেই দরজা খুলে রেখেছিল।

আহমদ মুসা দরজার নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল। তারপর দরজা লক করে লোকটিকে রাখল নিয়ে ঘরের মেঝের কার্পেটের ওপর।

লোকটির দু'হাত পিছ মোড়া করে বাঁধল। দু'পাও বাঁধল তার।

অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে এল লোকটার। জ্ঞান ফিরে পেতেই উঠে বসল। বলল, 'তুমি কে জানি না, কিন্তু মনে রেখ কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'সেটা আমিও জানি। যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও বাঁচাবেন তিনি আল্লাহ, দুনিয়ার কোন মানুষ নন তিনি।' হেসে আহমদ মুসা বলল।

'ব্ল্যাক ক্রসকে বিদ্রুপ করছ। জান না তুমি ব্ল্যাক ক্রসকে।'

আহমদ মুসা সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার বের করল। বলল, 'দেখ তোমার ব্ল্যাক ক্রসকে আমার জানা দরকার। আমি যা জানতে চাই তা ঠিক ঠিক বলবে। আমি দু'বার জিজ্ঞেস করি না, কোন জিজ্ঞাসার জবাব না পেলে দ্বিতীয় বার গুলি করব, কথা নয়।'

বলে আহমদ মুসা রিভলবার তুলল। গুলি করল। গুলিটা লোকটার বাম কানের লতি ছুঁয়ে চলে গেল। লতির ক্ষুদ্র আহত স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল।

লোকটা ভীষণ চমকে উঠে কানের লতি চেপে ধরল। ভয়ে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা বুঝল, লোকটা দেহে বড়, কিন্তু মনে খুব ছোট। এ ধরনের লোকদের মানসিক প্রতিরোধ কিছুমাত্র থাকে না।

আহমদ মুসা তার রিভলবার কপাল বরাবর তুলে কঠোর কণ্ঠে বলল, 'বল, ওমর বায়া কোথায়?'

লোকটা ফ্যাকাসে দৃষ্টি তুলে আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে বলল, 'হেড কোয়ার্টারের এক বাংলোতে আছে।'

'বাংলো কেন? ওটা তোমাদের বন্দীখানা?'

'না তাকে আমরা বন্দী রাখিনি। মুক্ত মানুষের মত তিনি আছেন।'

'মুক্ত মানুষের মত?'

লোকটা অনেকখানি সহজ হয়েছে। তার ভয় একটু কেটে গেছে। বলল, 'ওমর বায়ার আপনি কেউ? উনি তো এখন আমাদের মানুষ।'

'তার অর্থ?'

'ওমর বায়ার মন ও মাথা ধোলাই হচ্ছে। এখন তাকে যা কমান্ড করা হচ্ছে তাই করছে।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। হঠাৎ করেই তার মনে পড়ল কম্পিউটার পরিচালিত 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' এবং 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম'-এর কথা। তাহলে কি ওমর বায়ার ওপর এই নিউরোলজিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে? মনটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। ইতিমধ্যেই আহমদ মুসার কতটা ক্ষতি হয়েছে কে জানে!

বলল আহমদ মুসা, 'সেই বাংলোটা হেড কোয়ার্টারের কোথায়?'

'শুনে লাভ নেই, একটা সৈন্য বাহিনী ছাড়া ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারে ঢোকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

আহমদ মুসা রিভলবার তুলল। গুলী করল। এ গুলীটা লোকটার ডান কানের লতির অগ্রভাগ সামান্য আহত করে চলে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল কানের লতি থেকে।

লোকটা আগের মতই ভীষণ চমকে উঠে কানের লতি চেপে ধরল। তাড়াতাড়ি বলল, 'বাংলোটি হেড কোয়ার্টারের এক তলাতেই। সাগর বক্ষের ওপর ভাসমান তিনটি বাংলোর একটিতে রাখা হয়েছে ওমর বায়াকে। কিন্তু হেড কোয়ার্টার তিন তলায়।'

'সৈন্য বাহিনী ছাড়া তোমাদের হেড কোয়ার্টারে ঢোকা যাবে না, একথা বললে কেন?'

'কারণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তিন ইঞ্চি স্টিল শিটের প্রধান গেট কামান দাগা ছাড়া ভাঙ্গা বা খোলা যাবে না।'

'ভেতরে কত জন প্রহরী আছে?'

'গেটের 'সিকিউরিটি পুল'-এ সব প্রহরী থাকে। ইন্টারকম ও ওয়াকিটকির মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মত ডাকা হয়। তবে ওমর বায়ার বাংলোর চার ধারে প্রহরী আছে।'

'কোথায় প্রহরী প্রয়োজন জানা যায় কি করে?' গোটা হেড কোয়ার্টারে কি টিভি ক্যামেরা সেট করা আছে?'

'প্রধান গেট ছাড়া আর কোথাও নেই। হেড কোয়ার্টারে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কাছে ওয়াকিটকি আছে। ইন্টারকম তো রয়েছেই।'

'তোমাদের চীফ কোথায় থাকেন?'

'হেড কোয়ার্টারে। আজ নেই তিনি।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে ঘুমিয়ে থাকতে হবে। তারপর দেখা যাবে।'

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে একটা বিশেষ ক্লোরোফরম ভেজা তুলা এনে লোকটার নাকে চেপে ধরল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লোকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

আহমদ মুসা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল।

ছুটল তার গাড়ি।

গাড়ি এনে দাঁড় করাল রেস্টুরেন্টের সেই কার পার্কিং-এ।

ব্যাগ গাড়িতে রেখে গাড়ি লক করে এসে প্রবেশ করল রেস্টুরেন্টে আবার। আহমদ মুসার টার্গেট সেই ওয়েট্রেস। তার কাছ থেকে আরও কিছু তার জানা দরকার।

আহমদ মুসার সেই টেবিলটি তখন খালি। খুশি হলো আহমদ মুসা। বসল গিয়ে টেবিলে।

কিন্তু সেই ওয়েট্রেসকে দেখল না কোথাও।

আহমদ মুসা ভেজিটেবল স্যুপ নিয়ে ধীরে ধীরে খেল এবং অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু সে এল না।

দুপুরের খাওয়াটাও খেয়ে নিল আহমদ মুসা।

খাবার পরেও কফি নিয়ে অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু সেই ওয়েট্রেস এল না। আহমদ মুসা জিজ্ঞেসও করল না কাউকে।

আহমদ মুসা উঠবে উঠবে ভাবছে, এ সময় রেস্টুরেন্টে ঢুকেই মেয়েটি সোজা চলে গেল তাদের ডিউটি কাউন্টারের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বের হলো।

তারপর সোজা চলে এল আহমদ মুসার কাছে। হাসল। বলল, 'খেয়ে নিয়েছেন নিশ্চয়? আমার সেই বান্ধবীর কাছে গিয়েছিলাম। অনেক খবর আছে। রাতে এলে বলব।'

বলে সে কফির খালি কাপ নিয়ে চলে গেল।

ঠিক এই সময়েই জনা পাঁচেক ভীমাকৃতি লোক প্রবেশ করল রেস্টুরেন্টে। প্রবেশ করেই তারা পকেট থেকে রিভলবার বের করল। তাক করল আহমদ মুসাকে।

দ্রুত এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

সবার চেয়ে লম্বা কুস্তিগীর মার্কা লোকটা আহমদ মুসার সামনে আকাশ ফাটানো শব্দে হেসে উঠল। বলল, 'সোনার চাঁদ, এবার তোমাকে হাতে পেয়েছি। তুমি আমাদের চল্লিশ জনকে খুন করেছ।'

তার আকাশ ফাটানো হাসি এবং চিৎকারে গোটা রেস্টুরেন্টের কাজ থেমে গেছে। সকলের চোখে-মুখে আতংকের ছাপ। যে ওয়েট্রেস আহমদ মুসার কাছ থেকে কফির কাপ নিয়ে চলে যাচ্ছিল, সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে কাপ হাতে মূর্তির মত নিশ্চলভাবে।

একটু থেমেছিল লোকটি।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'তুমি আমাদের একজন লোককে কিডন্যাপ করেছিলে। কিন্তু ভাবনি এই কিডন্যাপই তোমার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে। জান কেমন করে কাল হলো?'

'তখন বুঝিনি এখন বুঝেছি।' অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'কি বুঝেছ?'

'তোমাদের ফ্ল্যাটের গেটে মুভি ক্যামেরা ফিট করা ছিল। ছবি দেখেই তোমরা তাকে উদ্ধার করেছে এবং আমাকে চিনতে পেরেছ।'

'আমরা জানি তুমি সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। বলত, তোমাকে না হয় চিনলাম ছবি দেখে, কিন্তু তোমাকে এখানে খুঁজে পেলাম কি করে?'

'আমার অনুমান সত্য হলে, তোমাদের সাথীর যে রিভলবার আমি পকেটে রেখেছি, তাতে 'ট্রান্সমিটার চিপ' আছে যা তোমাদের পথ দেখিয়েছে।'

লোকটার মুখ হা হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য এক বিস্ময় তার চোখ-মুখে।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বিস্ময়ের স্থানে জ্বলে উঠল খুনের আগুন। বলল, 'তোর এই বুদ্ধি আমাদের বিনাশ করেছে।'

বলে তার হাতের রিভলবারের বাট দিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার মাথায়।

মাথা সে কিছুটা সরিয়ে নেয়ার সময় পেয়েছিল। তার ফলে আঘাতটা মাথার বাম পাশ দিয়ে পিছলে গেল। পিছলে গেলেও মাথার এক খণ্ড চামড়া ও চুল তুলে নিয়ে গেল। ফিনকি দিয়ে বেরুল সেখান থেকে রক্ত।

'হা হা করে সেই আগের মতই আকাশ ফাটানো হাসি হেসে উঠল লোকটি।

হাসি থামলে বলল, 'চল শালা। ব্ল্যাক ক্রস কি এবার দেখবি।'

আহমদ মুসাকে ওরা চারদিক দিয়ে ঘিরে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে নিয়ে চলল।

'পিনপতন' নীরবতা রেস্টুরেন্টে।

সবাই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

ব্ল্যাক ক্রসকে ওরা যমের চেয়েও বেশি ভয় করে। জানে ওরা এসব ব্যাপারে ওদের সামান্য দোষ পেলে কুকুরের মত গুলী করে মারবে।

কিন্তু আহমদ মুসার সেই ওয়েট্রেসের এখন আর কোন ভয় নেই, তার জায়গায় ফুটে উঠেছে গভীর বেদনার ছাপ। তার মন শত মুখে বলছে, লোকটি নিশ্চয় ভালো কেউ, না হলে ব্ল্যাক ক্রসের শত্রু হবে কেন? তার বান্ধবী এলিসা গ্রেসের কাছে শোনা ওমর বায়ার মত এ লোকও বিপদগ্রস্ত কেউ কিনা! যেই হোক এই লোক, ব্ল্যাক ক্রসের সাথে টেক্কা দেবার সামর্থ্য রাখে। সাংঘাতিক বিপদেও তার মুখে ভয়ের কোন ছায়া পড়েনি। মাথায় অত বড় আঘাতেও তার ভ্রু পর্যন্ত কুঞ্চিত হয়নি।

কোথায় নিয়ে গেল লোকটাকে? নিজের মনেই প্রশ্ন করল ওয়েট্রেস। ইচ্ছা হলো বাইরে গিয়ে দেখে আসে কিন্তু পা তোলার সাধ্য তার হলো না।

ওয়েট্রেসের খুব দুঃখ হলো, লোকটাকে ওমর বায়ার কথা বলা হলো না। তার এই বিপদ না হলে নিশ্চয় তার কাছ থেকে ওমর বায়াকে উদ্ধারের কাজে মূল্যবান সাহায্য পাওয়া যেতো আজ।

ওয়েট্রেস বিমর্ষভাবে ফিরে গেল তার কাউন্টারে।

ব্ল্যাক ক্রসের লোকরা আহমদ মুসাকে নিয়ে গীর্জার পাশের দরজা দিয়ে ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করল।

প্রথম দরজাটা লোক দেখানো। এর পরের দরজাটাই আসল। স্টিল শীটের বিশাল দরজা।

দরজার কাছাকাছি হতেই দরজা খুলে গেল।

তারা প্রবেশ করতেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা দরজা দেখেই বুঝল এটা দুর নিয়ন্ত্রিত। টিভি স্ক্রিনে সবাইকে দেখে চিনেই দরজা খুলে দেয়া হয়।

গেট পেরিয়ে আহমদ মুসা সিকিউরিটি পুল দেখার জন্যে আশে পাশে তাকাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের বাটের একটা গুঁতা গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার মাথায়। পেছন থেকে একজন বলল, 'এদিক ওদিক তাকালে মাথা গুড়ো করে দেব।'

অনেক ওঠা-নামা ও অনেক পথ ঘুরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তারা আহমদ মুসাকে নিয়ে।

একজন এসে আহমদ মুসার হাতে হাত কড়া ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে ছুড়ে দিল দরজা দিয়ে একটা ঘরে।

দরজা বন্ধ করতে করতে একজন চিৎকার করে বলল, 'ঘুমাও যাদু ভালো করে। কর্তা এলে কাল মজার খেলা হবে তোকে নিয়ে।'

কথা শেষ করেই আকাশ ফাটানো শব্দে হেসে উঠল। হাসি না বলে একে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত বাঘের হুংকার বলাই ভালো।

৬

আহমদ মুসা ঘুম থেকে জাগল। মনে হল দীর্ঘক্ষণ সে ঘুমিয়েছে। ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকাল আহমদ মুসা। রাত ২টা। দুঃখের মধ্যেও খুশি হলো আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের ওপর। ওরা তাকে সার্চ করে রিভলবার ও ছুরি নিয়ে গেছে কিন্তু ঘড়ি নিয়ে যায়নি। রিভলবারের চেয়েও যা এখন তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আরও খুশি হলো এই জন্য যে তাকে ওরা পিছমোড়া করে বাঁধেনি। সম্ভবত ওরা হতে লোহার হাতকড়া পরিয়েই নিশ্চিত হয়েছিল। এ ধরনের হাতকড়া ভাঙা এবং খোলা দুই-ই অসম্ভব। পিছমোড়া করে না বাঁধায় ঘড়ি দেখতে পাবার ফলে যে আনন্দ হয়েছিল, শীঘ্রই তা উবে গেল। লোহার এ হাতকড়া সে ভাঙবে কি করে! আজকের এ রাতটা তার জন্যে মহামূল্যবান। সকালে ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান আসবে, তার আগেই কিছু একটা করার সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু হাতকড়া খোলার কোন পথ পেল না। হাতকড়া হাতের সাথে এমনভাবে লাগানো, যার ফলে হাতকড়ায় আঘাত করলে সে আঘাত গিয়ে লাগে হাতে।

ইতিমধ্যে রাত বাজল আড়াইটা। ঘড়ি দেখে অস্থির হয়ে উঠল।

কিন্তু উপায় কি?

হঠাৎ তার মনে পড়ল ডোনার দেয়া আংটির কথা। সাথে সাথে গোটা দেহ একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল।

সংগে সংগে ডান হাতের মধ্যমা থেকে আংটি খুলে ফেলল। অন্ধকারের মধ্যেও আংটির সেই ভয়ংকর বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় বিন্দুটিকে পরিকল্পনা করেই রেডিয়াম করা।

আহমদ মুসা আংটিকে পায়ের দুই বুড়ো আঙুলের ফাঁকে ধরে তারপর জোরে জোরে আংটির বিন্দুটার উপর চেপে ধরল হাতকড়ার লকটিকে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। লক উড়ে গেল বোধ হয় হাওয়ায়। আলগা হয়ে গেল হাতকড়া। খুলে পড়ে গেল হাত থেকে।

পায়ের বেড়িও খুলে ফেলল সে। আংটি আবার পরে নিল হাতে।

অন্ধকারের মধ্যে দেয়াল ধরে এগিয়ে গিয়ে পেয়ে গেল দরজা। হাত দিয়ে বুঝল দরজা স্টিল শিটের।

খুঁজে খুঁজে আহমদ মুসা দরজার লক বের করল। পরীক্ষা করে বুঝল দরজা দু'দিক থেকেই লক করা যায়।

আহমদ মুসা তার মধ্যমা চেপে ধরল দরজার লকের ওপর। চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই দরজা নড়ে উঠল। দরজা খুলে গেছে বুঝল আহমদ মুসা। ধীরে ধীরে টানল দরজা।

একটু ফাঁক হতেই এক ঝলক আলো এসে ঢুকল ভেতরে। ঠিক এই সময়ই পায়ের শব্দ পেল দরজার বাইরে। একজনের পায়ের শব্দ। থেমে গেছে পায়ের শব্দটি।

সংগে সংগেই বুঝল আহমদ মুসা, দরজা খুলে যাওয়া নিশ্চয় প্রহরীর নজরে পড়ে গেছে। বুঝার সাথে সাথেই আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ওকে প্রস্তুতির এক মুহূর্তও সময় দেয়া যাবে না। এখন আক্রমণই সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা।

আহমদ মুসা এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল। দেখল, বিস্ময়- বিমূঢ় লোকটা তার স্টেনগান তুলছে।

আহমদ মুসা দরজা খুলেই লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাম হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে তার স্টেনগান কেড়ে নিয়ে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে এল ঘরে।

লোকটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। তাকে ঘরে তোলার সময় আহমদ মুসার বাম হাতটা অনেকখানি ঢিলা হয়ে পড়েছিল।

লোকটি দু'হাতে আহমদ মুসার বাম হাত ধরে এক মোচড় দিয়ে নিজেকে খুলে নিল এবং আহমদ মুসার বাম হাতকে মুচড়ে তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা স্টেনগানটি ডান হাত থেকে ফেলে দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে এক পাক ঘুরে বাম হাতের মোচড়টা আলগা করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ডান হাতের একটা প্রচণ্ড কারাত চালাল লোকটার ঠিক কানের ওপর।

মুহূর্তেই লোকটা আহমদ মুসার বাম হাত ছেড়ে দিয়ে পাক খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত তার ইউনিফরম খুলে নিয়ে পরে নিল এবং লোকটির জামা খুলে তা দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বাধল। স্টেনগানের ফিতা খুলে নিয়ে বাঁধল তার পা এবং তার মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। প্রহরীর ইউনিফরম ও তার হ্যাট পরার পর আহমদ মুসাকে দূর থেকে চেনার আর কোন উপায় রইল না। কোন দিকে যাবে সে?

তার মনে আছে, প্রধান গেট থেকে অল্প কিছু আসার পর একটা সিঁড়ির নিচে একটা স্টিল স্ল্যাব সরিয়ে একটা সিঁড়ি পথে তাকে আন্ডার গ্রাউন্ডে নামিয়ে এনেছিল।

উপরে উঠার জন্যে এই একটা পথই তার জানা। তাকে ওপরে উঠতে হবে, তিন তলার বাংলোতে আছে ওমর বায়া।

ভূগর্ভ থেকে উঠার সিঁড়ির খোঁজে চলল আহমদ মুসা।

যে পথে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই পথেই সে এগিয়ে চলল।

চলার পথে কাউকে পেল না আহমদ মুসা। ভাবল, তাকে পাহারা দেয়ার জন্যে তাহলে ওখানে একজনকেই রাখা হয়েছিল। আহমদ মুসার মনে পড়ল যাকে সে কিডন্যাপ করেছিল তার কথা। সে বলেছিল, ওমর বায়ার ওখানে ছাড়া আর কোন প্রহরী নেই। প্রধান গেটের সামনে সিকিউরিটি পুলে সব প্রহরী থাকে। ইন্টারকম বা ওয়াকিটকি'তে তাদের প্রয়োজন মত নির্দেশ দেয়া হয়।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সিকিউরিটি পুলকে যদি নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যায়, তাহলে তার পথ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সিঁড়ি অবশেষে খুঁজে পেল আহমদ মুসা।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল সে।

সিঁড়ির মুখ স্টিল স্ল্যাব দিয়ে বন্ধ করা। এ স্ল্যাব সরিয়েই তাকে ভূগর্ভে নামানো হয়েছিল।

আহমদ মুসা স্টিল স্ল্যাবে কোন 'কি হোল' খুঁজে পেল না। স্টিল স্ল্যাবটা প্রধান গেটের মতই কি দূর নিয়ন্ত্রিত?

ভাল করে মনে করতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। একটা সিঁড়ির নিচে অবস্থিত স্ল্যাবটির কাছাকাছি তারা পৌঁছার সংগে সংগেই স্ল্যাবটি খুলে যায়নি তার পরিষ্কার মনে পড়ছে, একজন লোক একটু অগ্রবর্তী হয়ে স্ল্যবটির এক প্রান্তে দু'পা জোড় করে দাঁড়িয়েছিল কেন? দূর-নিয়ন্ত্রকদের জন্যে এটা কোন সিগন্যাল, না দু'পা জোড় করে দু'পা বা দু'বুড়ো আঙুল দিয়ে কারও ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ দিয়েছিল সে?

দূর-নিয়ন্ত্রিত হলে এ রকমটা হতো না, সুতরাং শেষোক্ত সম্ভাবনাকেই আহমদ মুসা ঠিক মনে করল।

পা দিয়ে চাপ দেয় সেই প্রান্ত কোনটা ছিল, মনে করতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। স্ল্যাবটি পূর্ব-পশ্চিম লম্বা। পূর্ব প্রান্ত ছিল সিঁড়ির গোঁড়ার দিকে। এর বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোকটি চাপ দিয়েছিল পরিষ্কার মনে পড়ল আহমদ মুসার।

উপরের দৃশ্যটা আহমদ মুসা নিচে এসে সেট করল এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, সিঁড়ির মুখ ও স্ল্যাব যেখানে একত্রিত হয়েছে সেটাই পূর্ব দিক। তাহলে চাপ দেয়ার জায়গাটা দাঁড়াচ্ছে আহমদ মুসার মাথার ওপর কোথাও।

আহমদ মুসা এক ধাপ নিচে নেমে মাথার ওপরের জায়গাটা পরীক্ষা করল। দেখতে পেল, স্টিল স্ল্যাবটি নিখুঁতভাবে সিঁড়ির কংক্রিট ছাদে ঢুকে যাওয়া ছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

আহমদ মুসা স্পষ্ট মনে পড়ছে, চপ দেয় হয়েছিল স্ল্যাবের ওপর নয়, স্ল্যাব-প্রান্তের ফ্রেমের ওপর। ফ্রেম এবং স্টিল স্ল্যাবের রং ছিল একই রকমের। কিন্তু এখানে তো স্ল্যাবের কোন ফ্রেম নেই।

আহমদ মুসা স্টেনগানের মাথা দিয়ে টোকা দিতে লাগল স্ল্যাব এবং কংক্রিটের ছাদের ওপর। খুশি হলো আহমদ মুসা। স্টিল স্ল্যাব যেখানে কংক্রিটের

ছাদে ঢুকে গেছে, সেখানে কংক্রিটের প্রান্তে টোকা দিলে ধাবত শব্দ পেল। বুঝল আহমদ মুসা রংটা কংক্রিটের মত হলেও ওটাই আসলে স্ল্যাব মুখের স্টিল ফ্রেম। আহমদ মুসার অনুমান অনুসারে এই ফ্রেমে চাপ দিলেই সিঁড়ি মুখের স্ল্যাব সরে যাওয়ার কথা।

আহমদ মুসা স্টেনগানটা বাম হাতে নিয়ে ডান হাত ওপরে তুলে চাপ দিল ফ্রেমটিতে। কিন্তু বার বার চাপ দিয়েও সিঁড়ি মুখের স্ল্যাবের কোন নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না।

মনে পড়ল আহমদ মুসার। লোকটি দু'পা লাগিয়েছিল, তাকেও তাহলে দু'পা লাগাতে হবে।

কিন্তু না দু'পায়ে চাপ দিয়েও কোন ফল হলো না।

আহমদ মুসা সিঁড়ির ওপর বসে চোখ বন্ধ করে ভাবল, তার কিছু কি ভুল হচ্ছে? না তার অনুমান গোটাটাই ভুল?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল, লোকটা দু'পা জোড় করে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়েছিল?

লোকটার ছবি ভেসে উঠল আহমদ মুসার চোখের সামনে। সে দু'পা জোড় করে ফ্রেমের ওপর রেখেছিল এবং জায়গাটা ছিল ফ্রেমের ঠিক মাঝখানে।

চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। উঠে দাঁড়াল বসা থেকে।

ছাদ রঙা ফ্রেমটা অনুমানে মেপে নিয়ে আহমদ মুসা ঠিক মাঝখানে দু'হাত লাগিয়ে চাপ দিল। সংগে সংগেই স্ল্যাবটা আহমদ মুসার চোখের সামনে থেকে সরে ছাদের ভেতরে ঢুকে গেল।

এক ঝলক তাজা বাতাস এসে আহমদ মুসার মুখ চোখ জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

এই সাথে আহমদ মুসা মানুষের কথা শুনতে পেল। ঠিক মাথার ওপরেই।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

বুঝল আহমদ মুসা, কেউ দু'জন কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে।

একজন বলছে, ‘কর্তা এই রাতেই আসছেন যে! আগামী কাল না আসার কথা?’

অন্যজন বলছে, ‘কোন বড় পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই। তাছাড়া যে শত্রু ধরা পড়েছে, সে অত্যন্ত ভয়াবহ। এই-ই নাকি আহমদ মুসা, তার ছবির সাথে নাকি এ মিলে গেছে। এটা জানতে পেরেই কর্তা রওয়ানা দিয়েছেন।’

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার পরিচয় তাহলে এতদিনে ব্ল্যাক ক্রসের কাছে ধরা পড়ে গেল! ওরা তো এখন পাগল হয়ে যাবে!

আহমদ মুসা ভাবল, পিয়েরে পল তাহলে আসছে! রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে। কয়টায় কে জানে? যে কোন সময়ই এসে পৌছতে পারে সে। সে আসা মানে একটা বড় দলবল নিয়েই সে আসবে, বিশেষ করে যখন আহমদ মুসার খবর পেয়েছে।

আহমদ মুসা আরও ভাবল, তার আসা অর্থাৎ বাড়তি শক্তি এখানে এসে পৌঁছার আগের এই সময়টাই ওমর বায়াকে উদ্ধারের সুবর্ণ মুহূর্ত।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, এই এক তলারই কোন এক স্থানে বন্দী আছে ওমর বায়া। ব্ল্যাক ক্রসের যে লোককে সে কিডন্যাপ করেছিল, তার কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। ওমর বায়া বন্দী আছে এক তলার ভাসমান একটা বাংলোতে। অতএব আহমদ মুসা সিদ্ধান্তে পৌঁছল, সাগর যেহেতু গীর্জার পশ্চিম দিকে, তাই সে যে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে পশ্চিম দিকে গেলেই ভাসমান বাংলো এলাকা সে পেয়ে যেতে পারে।

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ছোট্ট চত্বরটার চারদিকে নজর বুলাল। চত্বর থেকে তিনটা করিডোর তিনদিকে গেছে। পূর্ব দিকের করিডোরটা গেট পর্যন্ত গেছে বুঝল আহমদ মুসা। আর উত্তরেরটা বাড়ির উত্তর অংশে গেছে। তাহলে পশ্চিমের করিডোরটাই গেছে সাগরের দিকে। এ পথেই তাকে যেতে হবে।

তিনটি করিডোরের মুখেই দরজা আছে। কিন্তু তিনটি দরজাই খোলা।

আহমদ মুসা পশ্চিম দরজার দিকে এগোলো।

যাওয়ার সময় তার মনে জাগল, সিকিউরিটি পুল নিষ্ক্রিয় না করে তার এগোনো ঠিক হচ্ছে কিনা। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবল, সময় খুব কম।

সিকিউরিটি পুলের ওখানে গিয়ে হাঙ্গামায় পড়লে ওমর বায়ার কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে যেতে পারে। আগে ওমর বায়াকে উদ্ধার, পরে বের হবার পথ আল্লাহ একটা বের করে দেবেন।

দরজা পেরিয়ে করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা।

কয়েকটা বাঁক ঘুরে একটা করিডোরের মুখে এসে দাঁড়াল। এ মুখেও একটা দরজা আছে, তাও খোলা।

করিডোরের মুখই তিন তলা বিল্ডিংএর শেষ প্রান্ত। তারপরেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে ফাঁকা চত্বর। চত্বরটি উঁচু প্রাচীর ঘেরা। আহমদ মুসার সোজা সামনে প্রাচীরের বড় একটি দরজা।

প্রাচীরের ভেতরে বাংলোর চালাগুলো দেখতে পেল আহমদ মুসা। খুশি হলো তার মন। ঐ বাংলোর কোন একটিতে ওমর বায়া বন্দী আছে।

প্রাচীরের বাইরের পাশ বরাবর চত্বরটি ফাঁকা। আহমদ মুসা দেখল প্রাচীরের এ পাশ বরাবর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। চারজনকে সে দেখতে পাচ্ছে। দু'জন গেটে। আর দু'জন গেটের ডান ও বাঁ পাশে বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে।

দরজায় দাঁড়ানো প্রহরী দু'জন স্টেনগান হাতে ঝুলিয়ে দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

এই সময় আহমদ মুসা শুনতে পেল তার পেছন থেকে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। অনেকটা চমকে উঠেই পেছনে ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। কাউকে দেখল না, কিন্তু পায়ের শব্দ তার কাছে আরও স্পষ্টতর হলো। ওদের কথা বার্তাও শুনা যাচ্ছে। আহমদ মুসা বুঝল ওরা খুব কাছে চলে এসেছে। বাঁকের আড়াল না থাকলে এতক্ষণ সে তাদের চোখে পড়ে যেত।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকিয়ে দ্রুত দরজার আড়ালে গিয়ে লুকালো।

দরজার আড়াল থেকে আহমদ মুসা দেখল, জনা দশেক প্রহরী এগিয়ে আসছে করিডোর দিয়ে গল্প করতে করতে।

একজন লোক বলছে, একজন বন্দী লোক নিয়ে কর্তাদের এত ভয় কেন, বুঝলাম না?

গর্দভ, আহমদ মুসা একজন নয়, সে একাই একশ। বলল অন্য একজন।

ঠিক আছে। সে তো বন্দী। আমাদের কি কাজ এখানে? প্রহরী তো আছেই। বলল আগের লোকটি।

আমাদের কিছু কাজ নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওমর বায়ার ঘর পাহারা দেয়া। কর্তা এসে ওমর বায়াকে নিয়ে যাবে, তারপরেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। বলল দ্বিতীয় লোকটি।

দরজা বরাবর চলে এসেছে ওরা।

আহমদ মুসা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল।

ওদের শেষ লোকটি যখন দরজা বরবর তখন আহমদ মুসা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগল। মাথার হ্যাটটাকে কপাল পর্যন্ত নামিয়ে ওদের পেছনে একটু আলগা হয়ে চলতে লাগল আহমদ মুসা।

দলটি দরজার কাছে পৌছতেই দরজা খুলে গেল। গেটের প্রহরী দু'জন দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। আর ওরা ঢুকে গেল ভেতরে।

আহমদ মুসা ইচ্ছা করেই একটু পেছনে পড়েছিল।

গেটের প্রহরীদের একজন বলল, তাড়াতাড়ি কর দরজা বন্ধ করে দেব।

বলেই লোকটি তার সঙ্গী প্রহরীর লাইটারে সিগারেট ধরাতে গেল। তার সঙ্গী তখন সিগারেট ধরাচ্ছিল।

তাদের তাড়া খেয়ে লাফ দিয়েই যেন দরজায় গিয়ে পৌছল আহমদ মুসা।

সুযোগ সে নষ্ট করল না।

আকস্মাৎ সে প্রহরী দু'জনের কাছাকাছি গিয়ে তাদের দু'জনের মাথা ধরে ভীষন জোরে ঠুকে দিল। পরপর দু'বার।

ওরা সংগে সংগেই সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত ওদের বেল্ট থেকে দু'টি রিভলবার নিয়ে দু'পকেটে পুরে স্টেনগানটা হাতে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ঢুকল ভেতরে।

খোলা চত্বরটিতে তিনটি বাংলো। একটি দক্ষিণ প্রান্তে, আরেকটি উত্তর প্রান্তে এবং মাঝখানে একটি। মাঝখানেরটি ওই দু'টি বাংলোর সাথে এক লাইনে না হয়ে কিছুটা পশ্চিমে এগিয়ে।

মাঝখানের বাংলোতেই থাকে ওমর বায়া। আহমদ মুসাও এটা বুঝতে পারল মাঝখানের বাংলোর সামনে সেই দশ প্রহরীর জটলা দেখে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো সেদিকে। তার স্টেনগানের ব্যারেল নামানো কিন্তু তার আঙুলটি স্টেনগানের ট্রিগার স্পর্শ করে আছে।

ওদের কাছাকাছি পৌছেছে এই সময় পেছনে ফেলে আসা গেটের দিক থেকে কথার শব্দ পেল। চকিতে পেছনে ফিরেই দেখল গেট দিয়ে কয়েকজন প্রবেশ করছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, সামনের দৃশ্যপটও পাল্টে যাচ্ছে। একজন ওয়াকি-টাকিতে কথা বলছে, অন্যরা এ্যাটেশনের ভংগিতে দাঁড়াচ্ছে।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে, সে ধরা পড়ে গেছে। সংগে সংগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

চোখের পলকে শরীরটা সামনের দিকে একটু বাঁকিয়ে স্টেনগানের মাথা উঁচু করে ট্রিগারে আঙুল চেপে সামনের ওদের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।

স্টেনগানের ব্যারেল ওদের ওপর দিয়ে ঘুরে আসার পর কাউকেই দাঁড়ানো দেখা গেল না।

গুলী করেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছে।

গড়িয়ে চলল ওমর বায়ার বাংলোর দিকে। সামনের মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে পড়ে থাকা ঝাঁঝরা লাশগুলোর কাছে না পৌছাতেই গেটের দিক থেকে গুলী বৃষ্টি শুরু হলো।

কিন্তু গেটের সে স্থান থেকে আহমদ মুসার দুরত্ব স্টেনগানের পাল্লার জন্যে খুব অনুকূল নয়।

এ সুযোগে আহমদ মুসা চরকির মত গড়িয়ে ওমর বায়ার বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠল। যাবার সময় আহমদ মুসা ওদের একটা স্টেনগান ও এল এম জি টেনে নিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠে একটা থামের আড়াল নিল সে।

ওরা গুলী করতে করতে এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা জবাব দিল না ওদের গুলীর।

আহমদ মুসা ওদের বিভ্রান্ত করতে চায়, সাহসীও করে তুলতে চায়। ওদের এই ধারনা দিতে চায় যে আহমদ মুসা ওদের ঠেকানোর চাইতে এখন ওমর বায়াকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত।

এটা ছিল আহমদ মুসার কৌশল।

ওদের একজন বলল, নিশ্চয় শয়তানটা ভেতরে ঢুকে গেছে, এখন ওমর বায়াকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে। দৌড় দাও।

ওরা তিনজন মাথা নিচু করে দৌড় দিল ওমর বায়ার বাংলোর দিকে।

ওদেরকে আসতে দিল আহমদ মুসা।

কাছাকাছি এলে পিলারের আড়াল থেকে মাথা বের করে আবার এক পশলা গুলী বৃষ্টি করল স্টেনগান থেকে।

মাটির ওপর ঝরে পড়ে গেল ও তিনজন ও।

কিন্তু এ তিনজনের কাহিনী সাঙ্গ হতে না হতেই প্রাচীরের সেই গেটে এসে দাঁড়াল আরও বেশ কয়েকজন।

ঠিক এই সময় আহমদ মুসা পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে পেছনে ফিরল। দেখল উদ্যত রিভলবার হাতে একটি মেয়ে। তার পিস্তলের নল আহমদ মুসার কপাল ছুই ছুই করছে। বলল মেয়েটি কে আপনি? কোন পক্ষের?

মেয়েটি এলিসা গ্রেস।

ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সাথে লড়াই করতে দেখেও তাদের মারতে দেখেও যখন আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, তখন আমি নিশ্চয় আপনার পক্ষের। আমি ওমর বায়াকে মুক্ত করতে এসেছি।

আহমদ মুসার কপাল থেকে মেয়েটির রিভলবার নেমে গেল। বলল, আপনি কি আহমদ মুসা?

হ্যাঁ, এ নাম জানলেন কি করে?

ওমর বায়ার কাছে শুনেছি। শুনেছি, তাকে উদ্ধার করতে আপনিই আসতে পারেন।

ওমর বায়া কোথায়?

এই তো উনি আসছেন।

ওমর বায়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা ও ওমর বায়া সালাম বিনিময় করে একে ওপরকে জড়িয়ে ধরল। কেঁদে উঠল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা ওমর বায়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, এই সংগ্রামের নামই তো জীবন।

এই সময় গেটের দিক থেকে অব্যাহত গুলীর শব্দ ভেসে এল। ওরা এগোচ্ছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান তুলে ওদের দিকে এক পশলা গুলী বৃষ্টি করল।

ভাই জান আমি পালানোর একটা ব্যবস্থা করেছি। ওদের সংখ্যার কাছে আমরা দাঁড়াতে পারব না। চলুন আমরা যাই।

কোন পথে স্টেনগান থেকে গুলী করতে করতেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা?

গেট থেকে যারা অগ্রসর হচ্ছিল তারা শুয়ে পড়েছে। ওদের সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ হয়েছে।

এই চত্বর থেকে সাগরে নামার একটা গোপন পথ আছে। সেখানে আছে একটা গোপন জেটি। মি. লিটল পথ চেনে। আমি একটা বোটের ব্যবস্থা করেছি।

ধন্যবাদ বোন। মি. লিটল কে?

সে এই বাংলোর একজন পরিচালক। এখনকার একজন পুরানো লোক।

গোপন জেটিতে নামার পথ কোথায়?

সামনে সুইমিং পুলের ঐ যে টাওয়ার। টাওয়ারের গোড়ায় নিচে নামার একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামলে কিছু টয়লেট ও ভিডিও গেম স্টল। এখানকার একটা গোপন কক্ষ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে জেটিতে। লিটল চেনে। সে এখন টাওয়ারের নিচে অপেক্ষা করছে।

গার্ড নেই?

গার্ড নেই। তবে জেটিতে ঢোকার যে দরজা সেটার লক দূর নিয়ন্ত্রিত। কোন চাবি দিয়ে ওটা খোলা যাবে না। ভাঙতে হবে। ওটাই এখন প্রধান সমস্যা।

আপনারা প্রস্তুত?

জি, হ্যাঁ। বলল, এলিসা গ্রেস।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা স্টেনগান তুলে গুলী করল চত্বরের লাইট পোস্টের বাল্ব লক্ষ্যে। তারপর ভেঙে দিল সুইমিং টাওয়ারের বাল্বগুলোও।

ওমর বায়ার বাংলোর আলো আগে থেকেই নেভানো ছিল।

গোটা এ দিকটা অন্ধকারে ঢেকে গেল।

আহমদ মুসা দেখল, গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসায়ে ওরা দু'ভাগ হয়ে এক ভাগে দক্ষিণের বাংলো এবং অন্য ভাগ উত্তরের বাংলোর দিকে এগোবার উদ্যোগ নিচ্ছে। ঠিক এই সময় আরও কয়েকজন এসে সেই গেটে দাঁড়াল। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা পাশের দু'বাংলোর কভার নিয়ে দু'পাশ ও সামনে এই দিক থেকেই আহমদ মুসাদের ঘিরে ফেলতে চায়।

ওদের এই উদ্যোগে বাঁধা দেয়ার জন্যে আহমদ মুসা লাইট মেশিনগান পেতে দিয়ে ওমর বায়া ও এলিসা গ্রেস কে বলল, তোমরা গড়িয়ে গিয়ে টাওয়ারের নিচে নেমে যাও। আমি ওদের দেখছি।

আপনি? বলল, এলিসা।

আমি ওদের কিছুটা পিছু হটিয়ে দিয়ে আসছি।

বলেই আহমদ মুসা তার লাইট মেশিনগান থেকে গুলী বৃষ্টি শুরু করল।

আহমদ মুসা আড়াল নিয়ে গুলী করছে। ওদের আড়াল নেয়ার কিছু নেই। আর ওদের অবস্থান তখন পুরোপুরি লাইট মেশিনগানের আওতায়।

আহমদ মুসার লাইট মেশিনগান ব্যবহার খুবই কার্যকরী হলো।

ওরা দ্রুত পিছু হটল। যারা দু'পাশের বাংলোর দিকে যাচ্ছিল, তারাও দৌড় দিল গেটের দিকে।

আহমদ মুসা গুলী বন্ধ করে দ্রুত ক্রলিং করে এগোলো টাওয়ারের দিকে।

টাওয়ারের সিঁড়ি মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল ওমর বায়া। আহমদ মুসা তাকে নিয়ে দ্রুত নিচে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ি মুখের দরজা লক করে গেল।

তারা নামতেই এলিসা গ্রেস ডাকল।

সে দাঁড়িয়ে ছিল পশ্চিম প্রান্তের একটা খোলা দরজার সামনে।

আহমদ মুসা ও ওমর বায়া দৌড় দিয়ে সেখানে পৌছল।

এলিসা গ্রেস ঘরের দিকে ইংগিত দিয়ে তার বিপরীত দিকের একটা দরজা দেখিয়ে বলল, ওটা খুললেই জেটির সিঁড়ি। লিটলকে পাঠিয়েছি জেটি মুখের তালা ভাঙার জন্যে।

এই সময় ওপরের চত্বরে অব্যাহত গুলী বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল তারা।

চল তাড়াতাড়ি। ওরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে। অল্পক্ষনের মধ্যেই এসে পড়বে। জেটিতে বোট কখন আসবে? বলল, আহমদ মুসা।

এলিসা গ্রেস দ্রুত ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, এতক্ষণে এসে গেছে। জেটি থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করবে, সিগন্যাল দিলেই এসে ভিড়বে।

প্রায় মাথার ওপরেই এ সময় গুলীর শব্দ হলো। ওরা তাহলে টাওয়ারের গোড়ায় এসে গেছে

ওমর বায়া ও এলিসা গ্রেসের মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

তোমরা নেমে যাও। আমি এ দরজায় আছি। ওদের লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

ওমর বায়া ও এলিসা দ্রুত নিচে নেমে গেল।

টাওয়ারের গোড়ায় তখন অব্যাহত গুলীর শব্দ হচ্ছে। গুলীর শব্দ নিচে নেমে আসছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ওরা দরজা ভেঙে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান বাগিয়ে জেটিতে নামার সিঁড়ি মুখের দরজায় বসল। তার মাথা ছাড়া পেছন দিকটা সিঁড়িতে। অন্ধকারের কারণে সামনের করিডোর থেকে তার মুখও দেখা যাবে না।

মূহুর্ত কয়েক পরেই গুলী করতে করতে নেমে এল ওরা একদল। সাত আটজন।

নেমেই ওরা এগোলো আহমদ মুসা যেখানে বসে অপেক্ষা করছে সেই ঘরের দিকে। সমানে তারা গুলী করছে।

এবার ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। কয়েক সেকেন্ড ধরে গুলী বৃষ্টি করল তার স্টেনগান। যারা করিডোরে নেমেছিল তারা কেউ বাঁচল না।

আহমদ মুসা এবার দ্রুত নামল সিঁড়ি দিয়ে এবং ছুটল সিঁড়ির জেটির গেটের উদ্দ্যেশে।

বিশাল গেট।

আহমদ মুসা সেখানে পৌছে দেখল সবার মুখ ভয়ে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে। এলিসা গ্রেস বসে পড়েছে মেঝেতে অসহায়ভাবে। তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট শাবল দিয়ে গেটের তালা ভাঙার চেষ্টা করছে হস্তি দেহ লিটল।

আহমদ মুসা পৌছতেই এলিসা গ্রেস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সর্বনাশ দূর নিয়ন্ত্রিত এ লক খোলা যাবে না।

আবার ওপরে শোনা গেল স্টেনগানের অব্যাহত গুলীর শব্দ। মনে হলো ওরা টাওয়ারের নিচের করিডোর দিয়ে জেটিতে নামার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

এবার ভয়ে লিটলেরও হাতুড়ি থেমে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে এলিসা গ্রেস বসে পড়ল আবার মেঝেতে।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমরা ভয় করছ কেন? ব্ল্যাক ক্রসের কয়েকটা স্টেনগানের চেয়ে কি আল্লাহর শক্তি বড় নয়?

বলে আহমদ মুসা এগোলো সেই লকের দিকে।

লকটা পরীক্ষা করে বুঝল এটা কোন জটিল লক নয়। কোন প্রকারে লকের হুকটা সরিয়ে দিতে পারলেই দরজা খুলে যাবে।

আহমদ মুসা তার ডান হাতের মধ্যমা ধীরে ধীরে গোটা লকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গোটা লক। আর সংগে সংগেই দরজা শিথিল হয়ে গেল।

হাত দিয়ে দরজা টেনে ফাঁক করল আহমদ মুসা।

লাফিয়ে উঠল এলিসা গ্রেস। তার এবং লিটলের চোখে ভূত দেখার মত বিস্ময়।

গুলীর শব্দ কাছে চলে এসেছে। জেটিতে নামার সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছে ওরা।

আহমদ মুসা দ্রুত ওদের জেটিতে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে এলিসা গ্রেসকে বলল, আপনার বোটকে দেখুন। আমাদের হাতে সময় নেই।

সবাই চলে গেল জেটিতে।

আহমদ মুসা কাঁধ থেকে স্টেনগান নামিয়ে হাতে নিল। দরজা টেনে দিয়ে সামান্য খোলা রেখে তার সামনে একটা ক্রেন টাওয়ারের কভার নিয়ে বসল সে।

অল্পক্ষনের মধ্যেই দরজার ওপাশটা গুলীতে ভরে গেল। অবিরাম গুলীর আঘাতে স্টিলের দরজা অদ্ভূত এক বাদ্যযন্ত্রের রূপ নিল।

আহমদ মুসা কোন গুলী করল না।

কিছুক্ষণ গুলী করার পর ওদের কয়েকজনকে এক সাথে ছুটে আসতে দেখা গেল।

আহমদ মুসা ধীরে সুস্থে ওদের তাক করল। ট্রিগারে চাপ দিল আঙুল দিয়ে। ছুটে গেল এক পশলা গুলী ওদের দিকে।

দরজার কয়েক হাত দূরে ওরা আছড়ে পড়ল স্টিলের মেঝের ওপর।

কয়কজন ছুটে আসছিল। ওরা শুয়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পিছু হটে গেল।

গুলী বন্ধ করল আহমদ মুসা। কিন্তু ওদের তরফ থেকে গুলী আসছে অবিরাম।

আহমদ মুসা ভাই, আসুন। সব রেডি। চাপা চিৎকার করে বলল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা পেছন দিকে একবার চাইল। আবার সামনে তাকিয়ে আরও এক পশলা গুলী বর্ষণ করল। তারপর পিছন ফিরে ছুটল বোটের দিকে।

সবাই উঠেছে বোটে। বেশ বড় বোট।

আহমদ মুসা যখন বোটে উঠছিল তখন ওদের গুলীর আওয়াজ অনেকটা নিকটবর্তী মনে হলো। আহমদ মুসা ভাবল ওরা গুলী করতে করতে জেটির গেট পার হয়ে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা বোটে উঠার সংগে সংগে বোট ছেড়ে দিয়েছে। বোটের আলো নেভানো।

আহমদ মুসা বোটের চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে রেষ্ট নিল কিছুক্ষণ।

তারপর চোখ খুলল।

বোট চালাচ্ছিল বিশ বাইশ বছরের এক তরুন। আহমদ মুসার অচেনা।

এছাড়া বোটে আরও চারজনকে দেখল। একজন ওমর বায়া, অন্যজন এলিসা গ্রেস। তৃতীয় জন একটি তরুনী। এলিসা গ্রেসের গা ঘেঁষে বসে আছে। মাথা নিচু করে বসা। চিনতে পারল না আহমদ মুসা। চতুর্থ জন বিশাল বপু লিটল।

পেছনে ফেলে আসা ব্ল্যাক ক্রসের জেটি এবং চারদিকে একবার চেয়ে আহমদ মুসা এলিসা গ্রেসকে লক্ষ্য করে বলল, ধন্যবাদ আপনাকে, সুন্দর ব্যবস্থা আপনি করেছেন। এমন পরিকল্পনার জন্যে আপনাকে আবার ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ পাওয়া উচিত লিটলের। সেই আমাকে এ বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছে। সাহসও দিয়েছে। আর এই পিয়েরা পেরিন এবং সাহায্য না করলে কিছুই করতে পারতাম না।

ওদেরকেও ধন্যবাদ। বলে একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল এলিসা গ্রেসকে, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

পিয়েরা পেরিন নামক তরুনী মুখ তুলল। আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হলো।

আপনি? বলল আহমদ মুসা। তার কন্ঠে বিস্ময়!

জি আমি। ছোট্ট করে বলল মেয়েটি।

আপনারা পরস্পরকে চেনেন? কেমন করে? বলল এলিসা গ্রেস।

আমি তো ওদের রেস্টুরেন্টেই কয়েকদিন খানা খেয়েছি। ব্ল্যাক ক্রস তো আমাকে ওখান থেকেই ধরে নিয়ে আসে।

সেটা শুনেছি। তাহলে সেই আপনি? এলিসা গ্রেস বলল।

মিস পিয়েরাও আমাকে তার মুসলিম বংশোদ্ভূত একজন বান্ধবীর কথা বলেছিলেন, তাহলে সেই আপনি? এলিসা গ্রেসকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

পিয়েরা জবাব দিল জি হ্যাঁ।

তাহলে মিস এলিসা গ্রেস আপনার মা মুসলিম ছিলেন?

এলিসা গ্রেস মাথা নেড়ে তার মা ও তার নানীর কথা বলল। তারপর জানাল, পিয়েরা আমার কথা বলেছে কিন্তু তার কথা বলে নি। তার দাদাও একজন একজন আলজেরীয় মুসলিম পিতার সন্তান।

ঠিক। কিন্তু সেই শিকড়ের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি সব ভুলে গেছি। বলল পিয়েরা।

শিকড় থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, বিশেষ করে মুসলিমরা। আমি পারিনি। তুমিও তো পারলে না। যদি পারতে তাহলে জীবন বিপন্ন করে কেন এসেছ ওমর বায়াকে সাহায্য করতে?

হয়তো হবে। আমি আমাকেই জানি না। এটা ঠিক যে, একে যখন রেস্টুরেন্টে মুসলিম বলে জানলাম এবং যখন মি. ওমর বায়া মুসলিম হওয়ার কথা তোমার কাছে শুনলাম, তখন আমার যে আনন্দ হয়েছিল তার সাথে অন্য কোন আনন্দের তুলনা চলে না।

আপনারা দু'জনে আমার হৃদয়ের একান্ত শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। নিজের বোনকে অনেকদিন পরে কাছে পেলে যে আনন্দ হয়। আপনাদের দেখে সে আনন্দই আমার হচ্ছে। বলল, আহমদ মুসা এলিসা গ্রেস ও পিয়েরাকে লক্ষ্য করে।

এলিসা গ্রেস ড্রাইভিং সিটে বসা তরুনের দিকে চেয়ে বলল, ও লুই ডোমাস। খাস ফরাসি। ও পিয়েরার বন্ধু।

বলেই পিয়েরার দিকে চেয়ে বলল, নাকি আরও কিছু পিয়েরা?

তোমার মুখে কিছু বাধে না। এটা কি সময় এসব বলার? আমি বলব তোমার কথা? যাক ওমর বায়াকে আমি লজ্জায় ফেলতে চাই না।

এলিসা গ্রেসের মুখ লাল হয়ে গেছে। ওমর বায়া তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়ার দিকে এক পলক চেয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা তরুনের দিকে চেয়ে বলল, ওয়েলকাম ব্রাদার লুই ডোমাস। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে।

ধন্যবাদ স্যার। আপনার পরিচয় এলিসার কাছে শুনলাম। গর্ববোধ করছি আপনার পাশে বসতে পেরে। আমার জীবনে এটা সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হবে।

তোমার জীবন সুন্দর হোক ডোমাস। বলে আহমদ মুসা পিয়েরার দিকে চেয়ে বলল কোথায় যাচ্ছি আমরা বোন।

পিয়েরা সামনের দিকে চেয়ে বলল, আর মাইল খানিক পরে আমরা একটা প্রাভেট জেটিতে নামব। সেখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িতে করে আমরা আমার বাড়িতে উঠব। ছোট ফ্ল্যাট, কষ্ট হবে আপনাদের। কিন্তু আমি খুশি হব।

আমাদের জন্যে ও এটা খুশির খবর। কিন্তু এই বিপদে জড়ানো কি তোমার ঠিক হবে। এলিসা গ্রেসকে তো বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

এলিসার জড়িয়ে পড়া আর আমার জড়িয়ে পড়া একই কথা। তাছাড়া আমাদের পাড়াটা নিরাপদ। এলিসারও বাড়ি সেখানে। এই পাড়ায় আলজেরিয়া বংশোদ্ভূত অনেকগুলো পরিবার আছে।

তাহলে পিয়েরা ঐ পাড়ায় বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না। বিনা কারনে, বিনা অপরাধে অনেক পরিবার বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ব্ল্যাক ক্রস মনে করতে পারে আমার প্রতি, ওমর বায়ার প্রতি সকলের সহযোগিতা আছে।

তাহলে?

বলে পিয়েরা একবার এলিসা গ্রেস এবং একবার লুই ডোমাসের দিকে তাকাল।

কোন খালি বাড়ি বা কোন রেস্টহাউজ নেই, যেখানে গিয়ে আপাতত উঠা যায়?

একটা রেস্টহাউজ আছে চার পাঁচটা ঘর। নাম লা আটলান্টিক। একটা ছোট টিলার ওপরে সাগরের তীরে। একদম নির্জন। পর্যটকদের খুব প্রিয় জায়গাটা। কিন্তু ভাড়াটা অত্যন্ত বেশী।

খালি আছে? খুশি হয়ে বলল, আহমদ মুসা।

খালি থাকার কথা। সন্ধ্যা রাতেও খালি ছিল।

ধন্যবাদ লুই ডোমাস। আপাতত ঐখানেই আমরা উঠব।

লুই ডোমাস মাথা ঝুকিয়ে সায় দিয়ে সামনের দিকে নজর দিল।

ঘড়ির দিকে একবার তাকাল।

বোটের স্পীড বাড়িয়ে দিল সে।

৭

শুয়ে পড়লেও আহমদ মুসার ঘুম এলো না চোখে।

কেমন একটা অস্বস্তি মনে।

উঠে বসল। বসেও ভাল লাগল না। উঠে ব্যালকনিতে এল সে। দু'তলার ব্যালকনি। পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত আটলান্টিক। সত্যিই সুন্দর এই রেস্ট হাউসটা।

উপরে চারটা বেড রুম, নিচের তলায় চারটা।

গোটা ওপর তলাটাই দখল করেছে আহমদ মুসারা।

এক রুমে মশিয়ে লিটল। অন্য রুমে ওমর বায়া এবং লুই ডোমাস। তৃতীয় রুমটিতে এলিসা গ্রেস এবং পিয়েরা পেরিন এবং অন্যটিতে আহমদ মুসা।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তখনও অনেকটা বাকি।

আহমদ মুসার ঝুলন্ত ব্যালকনি থেকে পশ্চিম, দক্ষিণ উত্তর তিন দিগই দেখা যায়।

আটলান্টিকের অন্ধকার সৌন্দর্যে চোখ আটকে গিয়েছিল আহমদ মুসার। চাঁদ বিহীন রাতের তারকা খচিত অন্ধকার আকাশ যেমন আহমদ মুসার ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে রাতের অন্ধকার সমুদ্র। এ অন্ধকার সমুদ্রে আকাশের গভীরতা তো আছেই, তার সাথে আছে সমুদ্রের সরব কথা বলা। অন্ধকার থেকে উঠে আসা এ কথাকে অনন্তের একটা কন্ঠ বলে আহমদ মুসার মনে হয়। এর যে কত অর্থ করা যায়, কত যে মহাকাব্য রচনা করা যায়।

হঠাৎ উত্তর থেকে ভেসে আসা গাড়ির হর্নে চমকে উঠে আহমদ মুসা উত্তর দিকে তাকাল।

কিছুই দেখতে পেলনা।

কিছুক্ষণ নিরবতা।

তারপর সেই হর্ন আবার বেজে উঠল। পরপর দু'বার। সেই সাথে টিলার নিচের সমভূমিতে একটি গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেল আহমদ মুসা। গাড়ীর গতি টিলার দিকেই।

গাড়িটির হর্ন এই দ্বিতীয় বার শোনার সাথে সাথেই আহমদ মুসার গোটা দেহ প্রবল এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল।

ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ি? আসছে এই রেস্ট হাউসের দিকে?

সংগে সংগেই আহমদ মুসার মনে হলো যেমন করে তার সন্ধান পেয়েছিল ওরা, সেভাবেই কি এখানকার সন্ধান ওরা পেল? তাহলে ওমর বায়া কিংবা এলিসার পোশাক পরিচ্ছদ বা অন্য কোন কিছুতে ট্রান্সমিটার চীপ সেট করা আছে?

আর ভাবতে পারল না আহমদ মুসা।

ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ী দ্রুত ঢাল বেয়ে উঠে আসছে টিলার শীর্ষে অবস্থিত রেস্ট হাউসের দিকে।

আহমদ মুসা ছুটল তার ঘরের দিকে। ঘুমাবার পোশাক পাল্টাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি সে স্টেনগান ও রিভলবারটা তুলে নিয়ে ছুটল নিচে। ব্ল্যাক ক্রসকে কিছুতেই রেস্ট হাউসে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এখানে এসে একবার ওরা ভেতরে ঢুকতে পড়তে পারলে ওদের ঠেকানো কঠিন হবে সুতরাং আগেই ঠেকাতে হবে ওদের।

নেমে গেল আহমদ মুসা নিচে।

কেউ জেগে নেই।

আহমদ মুসা গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রেস্ট হাউসের একটি মাত্র গেট সেটা উত্তর দিকে। নিচে উপত্যকা থেকে এঁকে বেঁকে উঠে আসা রাস্তা গেটে এসে ঠেকেছে। গেটটা বড় এবং মজবুত।

একজন সার্বক্ষণিক দারোয়ান থেকে গেটে।

সব সময় সকল মেহমানের জন্যেই গেট খোলা। সুতরাং কেউ চাইলে সংগে সংগেই গেট খুলে দেয়া হয়।

আহমদ মুসা একবার মনে করল গেটম্যান নিষেধ করবে খুলতে। কিন্তু তার আর সময় হলো না। ওরা এসে গেছে।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকিয়ে গাড়ি বারান্দার দক্ষিণ দিকে পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে পাথরের উঁচু প্লাটফর্মের ওপর একটা ভাস্কর্য দেখতে পেল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে ভাস্কর্যের বেদির আড়ালে বসল।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সেখানে বসে গেট থেকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত গোটা রাস্তা এবং গাড়ি বারান্দা থেকে রেস্ট হাউসের রিসিপশন পর্যন্ত সবটুকু জায়গা পরিষ্কার নজরে পড়ছে।

রেস্ট হাউসের বাইরের সেই গেটটা খুলে যেতে দেখল আহমদ মুসা।

গেট দিয়ে এক এক করে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা সাত জন লোক।

গাড়ি ভেতরে না নেয়া থেকে আহমদ মুসা বুঝল, ওরা দ্রুত কাজ সেরে ফিরতে চায়।

সাত জনের হাতেই স্টেনগান।

আহমদ মুসাদের গাড়ি গেটের ভেতরে গাড়ি পার্কিং এ দাঁড়িয়ে ছিল।

এই সময় একজন বাইরে গেল। পরক্ষনেই পাজাকোলা করে কাউকে এনে ফেলে দিল গেটের ভেতরে। লোকটি দারোয়ান। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হয়েছে।

যে লোকটি তাকে বাইরে থেকে নিয়ে এল সেই তাকে আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে ইংগিত করে কি যেন জিজ্ঞেস করল।

তারপরেই সেই লোকটি পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির সামনের দু'টি চাকায় গুলী করে ফুটো করে দিল।

আহমদ মুসা ভাবল, এই লোকটিই সম্ভবত দলের সর্দার।

গাড়ির চাকা ফুটো করে দেয়ার পরই তারা একসাথে দ্রুত বিড়ালের নিঃশব্দে ছুটে এল গাড়ি বারান্দার দিকে।

আহমদ মুসা মনে মনে খুবই কষ্ট পেল ওদের অসহায়ত্ব দেখে।

একটা ব্রাস ফায়ারে ওরা সবাই শেষ হয়ে যাবে।

আহমদ মুসার স্টেনগানটা উঠতে চাইল না। এই ভাবে মানুষ হত্যায় তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। যদিও জানে এদের না মারলে ওরাই মারবে তবুও।

ওরা সবাই গাড়ি বারান্দায় এসে পৌঁছেছে।

আহমদ মুসা ভাস্কর্যের পেছনে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওদের উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা ধরা পড়ে গেছে। ঘেরাও হয়েছ তোমরা। স্টেনগান ও রিভলবার মাটিতে ফেলে ....।

আহমদ মুসার কথার শব্দ পেতেই ওরা সাঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। সংগে সংগেই স্টেনগানের ব্যারেল উঁচু হয়েছে তাদের। গুলীর বৃষ্টি ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সে গুলীর স্রোতের মধ্যে কথা শেষ না করে বসে পড়ল। ভাস্কর্যের আড়ালে না থাকলে আহমদ মুসার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত। ভাস্কর্যের গায়ে লেগে ছিটকে পড়া বুলেটের স্তূপ গড়ে উঠল ভাস্কর্যের গোড়ায়।

আহমদ মুসা বসে পড়েই স্টেনগান চালাল ওদের লক্ষ্য করে। ওপক্ষের গুলীতে কিছুটা ছেদ পড়ল।

সংগে সংগে আহমদ মুসা চকিতে ওদিকে একবার তাকিয়ে স্টেনগানের ব্যারেল কিছুটা ঘুরিয়ে নিল। গাড়ী বারান্দায় কোন আড়াল নেই। গাড়ী বারান্দা থেকে রিসেপশনে ঢুকার আগে আড়াল পাওয়ার কোন উপায় নাই।

আহমদ মুসার গুলির মুখে ওরা সেই চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু গুলী তাদের রেহাই দেয় নি। গাড়ী বারান্দা ও রিসেপশনের দরজা পর্যন্ত ৬টি লাশকে আহমদ মুসা পড়ে থাকতে দেখল।

আরেকজন কোথায়? চমকে উঠল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

দেখল, একজন সাপের মত এগিয়ে আসছে ভাস্কর্যের দিকে। সে এসে পৌছে গেছে ভাস্কর্যের গোড়ায় পাথরের প্ল্যাট ফরমের কাছে।

আহমদ মুসা নিঃশব্দে পাথরের প্ল্যাট ফরমটির ওপর উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে ব্ল্যাক ক্রসের লোকটির ওপর।

ঝাঁপিয়ে পড়েই আহমদ মুসা তার হাতের পিস্তল কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

লোকটি প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে আহমদ মুসাকে গায়ের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রবল বেগে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ছিটকে পড়ে গেল।

লোকটা ব্ল্যাক ক্রসের এই অভিযানের নেতাই হবে। এই লোকটাই আহমদ মুসাদের গাড়ির টাওয়ার ফুটো করে দিয়েছিল এবং ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সামনে এগোবার সময় এই লোকটিই নেতৃত্ব দিয়েছিল।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সরে গেল।

লোকটার বিশাল বপু আছড়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সরে গিয়েই উঠে দাঁড়াল।

লোকটা শুয়ে থেকেই একটু গড়িয়ে এসে চোখের পলকে দু'টি পা ছুড়ে মারল আহমদ মুসার দুই পা লক্ষ্যে।

আকস্মিক এই আঘাতে গোড়া কাঠা গাছের মত পড়ে গেল আহমদ মুসা।

উঠে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

লোকটা এসে পড়ার আগেই আহমদ মুসা তার দু'টি পা বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়েছিল। লোকটা গায়ের ওপর এসে পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসা পা দু'টি দিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলল।

উল্টে গিয়ে আহমদ মুসার পেছনে পড়ে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

লোকটা পড়ে গিয়েই এবার রিভলবার বের করল। কিন্তু রিভলবার তাক করার আগেই আহমদ মুসা লাথি ছুড়ল তার রিভলবার ধরা হাত লক্ষ্যে।

ছিটকে পড়ে গেল লোকটার হাত থেকে রিভলবার।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে তুলে নিল তার রিভলবার।

কিন্তু রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখল আহমদ মুসা, লোকটার হাত উদ্যত হয়েছে একটা ছুরি ছুড়ে মারার জন্যে।

আহমদ মুসা তাকে সে সুযোগ আর দিল না। ট্রিগার টিপল রিভলবারের। একটা বুলেট গিয়ে তার কপাল ফুটো করে ঢুকে গেল।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

আহমদ মুসা সে লাশের দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে দাঁড়াল এবং চলল রেস্ট হাউসের দিকে।

রেস্ট হাউসের ল্যান্ড লেডি মহিলাসহ ওমর বায়ারা পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে রিসেপশন কক্ষের দরজার বাইরে।

ভয়ে, বিস্ময়ে তাদের চোখ ছানাবড়া। ফ্যাকাসে হয়ে তাদের সবার মুখ। আহমদ মুসা নিকটবর্তী হতেই ল্যান্ড লেডি বৃদ্ধা মহিলাটি চোখ কপালে তুলে বলল, এসব কি? এরা কারা?

হয়তো ডাকাত হবে।

দারোয়ান কোথায়?

গেটের কাছে দারোয়ানকে বেঁধে ফেলে রেখেছে।

তুমি বৎস খুব সাহসী। এতগুলো ডাকাতকে সামাল দিয়েছ। থামল একটু। তারপর আবার বলা শুরু করল, তুমি দেখছি নাইট ড্রেস পরেই বেরিয়েছ। টের পেলে কি ভাবে।

ইশ্বর সাহায্য করেছেন।

'কিভাবে?' বিস্ময় ল্যান্ড লেডির চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা বলল সব কাহিনী। শেষে বলল, 'আমাদের এখনি চলে যেতে হবে।'

'কেন? কেন?'

'আমি তো ডাকাতদের মেরেছি। ওদের সাথীরা আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে।'

'তুমি ফরাসী পুলিশের ওপর আস্থা রাখ না? তাছাড়া পুলিশকে এদের কথা বলবে কে, তুমি ছাড়া?'

‘দারোয়ান আমার চেয়ে বেশি জানে। আপনি বিল রেডি করুন ম্যাডাম।’

বলে আহমদ মুসা ওমর বায়াদের বলল, ‘তোমরা তৈরি হও। এখনি বেরুতে হবে।’

আহমদ মুসারা সবাই ওপরে উঠতে লাগল।

আহমদ মুসা ভাই আমার জন্যে আপনার এত কষ্ট। সহ্য হচ্ছে না আমার।’ উঠতে উঠতে বলল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। সবাই দাঁড়াল তার সাথে।

আহমদ মুসা তাকাল ওমর বায়ার দিকে। বলল, ‘একজন মুসলমানের মত কথা বল ওমর বায়া। জীবনটাই একটা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে হাসি আছে কান্নাও আছে।’

‘স্যরি।’ বলল ওমর বায়া।

‘ওরা কারা জনাব? সত্যিই ডাকাত?’ বলল এলিসা গ্রেস।

‘না, ব্ল্যাক ক্রস।’

‘ওরা কি আবার হামলা করতে আসবে এখানে?’

‘না। কারণ আমরা চলে যাচ্ছি।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল সবাই।

রিসেপশনে দাঁড়িয়েছিল ল্যান্ড লেডি।

আহমদ মুসা যেতেই একটা স্লিপ তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা নজর বুলিয়ে দেখল, এক হাজার ফ্রাংক।

আহমদ মুসা ল্যান্ড লেডির হাতে পাঁচশ’ ফ্রাংকের তিনটি নোট তুলে দিল।

তিনটি নোটের দিকে তাকিয়েই বৃদ্ধা ল্যান্ড লেডি আকর্ণ হাসল। বলল, ‘তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার যেমন সাহস, তেমনি মন। তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস, তাই না বাছা?’

‘নিশ্চয়।’

‘বেশ বেশ। খুব ভালো। আমিও গীর্জায় যাই। অনেকেই যাই না। বলে, সমস্যা বাড়িয়ে লাভ কি?’

‘অন্ধেরা তা বলবেই। ধর্মকে যারা বাদ দিয়েছে, তাদের সমস্যা শত সহস্র গুণ বেড়েছে।’ বলে আহমদ মুসা ল্যান্ড লেডিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পা বাড়াল বাইরে বেরুবার জন্যে।

সবাই বেরিয়ে এল আহমদ মুসার সাথে।

‘আমাদের গাড়ির টায়ার তো ওরা নষ্ট করে গেছে। এক্সট্রা টায়ার তো নেই গাড়িতে।’ বলল এলিসা গ্রেস।

‘ওদের গাড়ি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ও গাড়িতেই আমরা যাব।’

সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গাড়িতে উঠে এল সবাই।

গাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল আহমদ মুসা। এক টুকরো কাগজও কোথাও পেল না। এমনকি গাড়ির ব্লু বুক এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সও না।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছিল আহমদ মুসা।

পাশেই বসেছিল লুই ডোমাস। বলল, ‘এখন আমরা পিয়েরা কিংবা আমার বাসায় যেতে পারি।’

‘এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার একটা সময়!’ প্রথমে লুই ডোমাসের দিকে, পরে পেছনে তাকিয়ে বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘লুই ডোমাস যে প্রস্তাব দিয়েছে, সে জন্যে তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা, মানে আমি, ওমর বায়া এবং এলিসা গ্রেস যেখানেই যাবো, সেটাই ব্ল্যাক ক্রসের টার্গেট হয়ে উঠবে ওরা জানতে পারলেই। অথচ বিপদ যত কমানো যায়, ততই ভালো। সুতরাং লুই ডোমাস কিংবা পিয়েরা যাতে ব্ল্যাক ক্রসের সন্দেহের বাইরে থাকে, এজন্যে এখন তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়া দরকার।’

কথাটা শুনে পিয়েরার মুখটা ছোট্ট হয়ে গেল। বলল, ‘যুক্তি হিসেবে আহমদ মুসা ভাইজানের সাথে আমি একমত। কিন্তু যুক্তিই সবকিছু নয়। আমি ও লুই ডোমাস কিছুতেই আপনাদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। আহমদ মুসা ভাই হলেও পারতেন না।’

‘আপনার পরিকল্পনা কি জনাব?’ বলল লুই ডোমাস।

‘আমি এখন প্যারিসে যেতে চাই। সেখানে গিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করব।’

‘তাহলে আমরাও প্যারিস যাব।’ বলল পিয়েরা।

‘এখন কোথাই যাচ্ছি?’ বলল লুই ডোমাস।

‘সেটা তুমিই বলবে। আপাতত শহরের আশেপাশে বা প্যারিসের পথের ওপর কোন রেস্ট হাউসে উঠতে চাই। বিশ্রাম হবে। সেই সাথে এ গাড়ি বাদ দিয়ে অন্য কোন গাড়ি জোগাড় করতে হবে। আমার গাড়িটা পড়ে আছে পিয়েরার রেস্টুরেন্টের সামনে। ওটা আনলে নতুন কোন গাড়ি আর লাগবে না। কিন্তু তার আগে এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়ার পোশাক পাল্টাতে হবে। আমারও। এগুলোতে ‘ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার চিপ’ আছে বলে আমি নিশ্চিত। এই ট্রান্সমিটার চিপই রেস্ট হাউসে ব্ল্যাক ক্রসকে ডেকে এনেছিল।’

‘আমার বাসায় এ ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে। যাবার পথে নিয়ে যাব।’ বলে পিয়েরা একটু থেমে আবার শুরু করল, ‘আপনার সে গাড়ি ওখানে নেই। আমার বান্ধবীকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতে বলেছি।’

‘ধন্যবাদ পিয়েরা। কখন করেছ এটা?’

‘আপনার গাড়ি আমি চিনতাম। আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার পর আমার এক বান্ধবীকে দিয়ে এটা করেছি আমি।’

‘তুমি খুব বুদ্ধিমতী। তোমাকে আবার ধন্যবাদ।’

‘ওয়েলকাম ভাইজান।’

‘আমাদের এ শহর থেকে দশ মাইল দূরে ইলের নদীর তীরে প্যারিস গামী রোডের ওপরই কয়েকটা রেস্ট হাউস আছে। ওগুলোরই কোন একটিতে উঠতে পারি আমরা।’ বলল লুই ডোমাস।

‘ধন্যবাদ লুই ডোমাস। সুন্দর সিলেকশন তোমার।’

ইলের ছোট একটা নদী।

পূর্বে অল্প দূরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকে গিয়ে পড়েছে।

সুন্দর নদী।

নদীর দু'তীরেই ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস। অনেকগুলো।

দুর্ভাগ্য আহমদ মুসাদের। রেস্ট হাউসগুলো একদম ফুল। উইকএন্ড হওয়ার কারণেই এই দশা।

অবশেষে তিন রেস্ট হাউসে তাদের ছয়জনের জায়গা হলো। একটিতে দুই, আরেকটিতে তিন এবং অন্যটিতে একজন।

তিনটি রেস্ট হাউসই পাশাপাশি।

দু'টি রুম যেখানে পাওয়া গেল, সেখানে থাকল এলিসা গ্রেস এবং পিয়েরা। তিন কক্ষ যেখানে পাওয়া গেল সেখানে থাকল ওমর বায়া, লুই ডোমাস ও লিটল এবং তৃতীয়টিতে থাকল আহমদ মুসা স্বয়ং।

ব্ল্যাক ক্রস প্রধান পিয়েরে পল ক্রোধে উন্মত্ত প্রায়। তার হেড কোয়ার্টারের গোটা জনশক্তিই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে ওমর বায়াকে আটকাতে গিয়ে আহমদ মুসার হাতে। পিয়েরে পল বিশাল সভাকক্ষের বিশাল টেবিলের সামনে বসে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়ছে যেন।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার ডান্তন। তার মাথা নিচু।

'বল কি করে এত বড় ঘটনা ঘটল?'

'স্যার এর উত্তর দেবার জন্যে কোন দায়িত্বশীল অফিসার হেড কোয়ার্টারে অবশিষ্ট নেই।' মাথা নিচু রেখেই বলল ডান্টন।

'আমি বুঝতে পারছি না ডান্টন, ব্ল্যাক ক্রসের অপরাজেয় অপারেশন কমান্ডার আবে দুরুয়া-এর মত লোক তার বাছাই করা আড়াই ডজন গার্ডসহ নিহত হলো হেড কোয়ার্টারে। তবু একজন আহমদ মুসাকে ওরা প্রতিরোধ করতে

পারল না, ওমর বায়াকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলই। এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কিভাবে ঘটল?’

‘স্যার, আমাদের লোকেরা এবং আবে দুরুয়া চেষ্টার ত্রুটি করেনি। না হলে তাদের সবাইকে এভাবে জীবন দিতে হতো না।’

‘গর্দভ ডান্টন, এটাই তো জ্বালার কারণ। একজন আহমদ মুসা বন্দী হয়েও এত বড় ঘটনা ঘটিয়ে চলে গেল।’

‘স্যার সবাই বলে, ওর সাথে মুসলমানদের আল্লাহ স্বয়ং নাকি কাজ করেন।’

‘গর্দভ, আমদের সাথে ঈশ্বর পুত্র যিশু নেই?’

‘স্যার, ঈশ্বর পুত্র মানুষ মাত্র। আর ওদের সাথে খোদ ঈশ্বর আছেন। তার ওপর আমরা গীর্জায় যাই না।’

‘আবার গ্রেট গর্দভ। আমি তুমি গীর্জায় যাই না, কিন্তু অনেকেই তো যায়। তাছাড়া আমরা তো বিশ্বব্যাপী যিশুর সাম্রাজ্য কায়েমেরই চেষ্টা করছি।’

এই সময় পিয়েরে পলের ইন্টারকম কথা বলে উঠল। কথা বলছে ইনফরমেশন চীফ। তার কণ্ঠ: ‘স্যার এই মাত্র জানা গেল, রেস্ট হাউস লা আটলান্টিক-এ আমাদের সাতজন লোককে নিহত পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে আমাদের সহকারী কমান্ডার ভলতেয়ারও রয়েছে।’

থামল কণ্ঠ।

মুহূর্তে পিয়েরে পলের চোখ-মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠল। গর্জে উঠল তার কণ্ঠ, ‘খবর এটুকুই? আরো বলেনি যে, মুসলমানদের আল্লাহ স্বয়ং নেমে এসে ওদের হত্যা করে গেছে! যত্ত সব গর্দভ।’

পিয়েরে পলের হাতে সিগারেটের একটা পাইপ ছিল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে লাগল। তার চোখ দু’টি লাল এবং চুল উস্কু-খুস্কু। উন্মত্তের মত দেখাচ্ছে তাকে।

এক সময় পাইচারি থামিয়ে ডান্টনের দিকে চেয়ে বলল, ‘ডান্টন, বুঝতে পারছ, ব্ল্যাক ক্রস সত্যিই আজ দারুণ সংকটে। বলতে গেলে ব্ল্যাক ক্রসের হাত-

পা সব ভেঙে গেছে। ওমর বায়া শনির মতই আমাদের হাতে এসেছিল। শনিটাকে আবার যদি হাতে পেতাম, তাহলে গোটাই চিবিয়ে খেতাম।'

বলে পিয়েরে পল এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

'ওমর বায়া শুধু নয় স্যার, ওকুয়াই তো আমাদের এ বিপদে ফেলেছে।' ধীরে ধীরে বলল ডান্টন।

'চুপ গর্দভ, ওকুয়া তো তার স্বার্থে কিছু করছে না। যা করছে তা ঈশ্বর পুত্র যিশুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই।'

পিয়েরে পলের টেলিকম আবার কথা বলে উঠল। কণ্ঠ ইনফরমেশন চীফের। তার কণ্ঠে উত্তেজনা। বলল, 'স্যার, আমাদের ওয়্যারলেস ট্রাফিক কনট্রোল জানাল, 'আমাদের সহকারী অপারেশন কমান্ডার ভলতেয়ার যে গাড়ি নিয়ে 'লা আটলান্টিক' রেস্ট হাউসে গিয়েছিল, সেই গাড়িটা মোরলেক্স গামী রোড ধরে এগিয়ে এখন ইলের নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ওয়্যারলেসের ভূ-প্রান্তিক বিমিং স্থির রয়েছে।'

'সে জায়গা কোনটা চিহ্নিত করো।' টেবিলে এক দারুন মুষ্ঠাঘাত করে বলল পিয়েরে পল।

'চিহ্নিত করা হয়েছে স্যার। গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে ইলের নদীর তীরে 'লা উলের' রেস্ট হাউসে।' বলল ইনফরমেশন চীফ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিয়েরে পল। বলল, 'ডান্টন, তুমি গিয়ে গাড়ি রেডি কর। আমি আসছি।'

'আপনি নিজেই যাবেন স্যার?'

'আর কে আছে গর্দভ?'

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই পিয়েরে পলের গাড়ি যাত্রা করল ইলের নদীর 'লা ইলের' রেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে।

পিয়েরে পলের গাড়ি যখন 'লা ইলের' রেস্ট হাউসের সামনে পৌঁছল, তখন রাত বেশ বাকি।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল পিয়েরে পল।

ঠিক ‘লা আটলান্টিকে’ যে গাড়িটা তাদের গিয়েছেল, সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

পিয়েরে পল তার ‘মাস্টার কি’ দিয়ে গাড়িটা খুলে ভেতরে একবার নজর বুলিয়ে গাড়ির দরোজা বন্ধ করে ছুটল রেস্ট হাউসের রিসেপশনের দিকে।

রিসেপশনে বসেছিল একটি মেয়ে।

পিয়েলে পল মেয়েটির সামনে নিজের কার্ড মেলে ধরে বলল, ‘গত এক ঘণ্টায় রেস্ট হাউসে কে কে এসেছে জানতে চাই।’

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করে বলল, ‘এক মিনিট স্যার বলছি।’

মেয়েটি রেজিস্টারের ওপর নজর বুলিয়ে বলল, ‘এক ঘণ্টার মধ্যে এসেছে একজন নিগ্রো। নাম ওমর। হস্তি আকৃতির একজন এসেছে, নাম লিটল।’ নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে মেয়েটি হাসল।

কিন্তু পিয়েরে পলের চোখ দু’টি জ্বলে উঠল আগুনের মত। আর নিগ্রোর নাম ওমর শুনে চোখ দু’টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিজয়ের আনন্দে।

‘গত এক ঘণ্টার মধ্যে আরেকজন তরুণ এসেছে। নাম লুই ডোমাস।’ বলল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি।

‘গোল্লায় যাক তোমার লুই ডোমাস। তুমি বল, ‘নিগ্রো’ ওমর এবং ‘লিটল’ নামের লোকটি কোথায় আছে।’ অধৈর্য কণ্ঠে বলল পিয়েরে পল।

‘ওরা পাশাপাশি দুই কক্ষে রয়েছেন। সাত তলায়। নাম্বার ৭১৫ এবং ৭১৬।’

মেয়েটিকে ধন্যবাদটুকুও না জানিয়ে পিয়েরে পল তার পেছনের লোকদের বলল, ‘তোমরা এস আমার সাথে।’

বলে পিয়েরে পল ছুটল লিফটের দিকে।

পিয়েরে পলের হাতে রিভলবার। অন্য সকলের হাতে স্টেনগান।

ওরা লিফটে উঠে গেলে রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সহকারী কাঁপতে কাঁপতে এসে রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে বলল, ‘পুলিশে টেলিফোন কর তাড়াতাড়ি।’

রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বলল, ‘পুলিশের বাপ ওরা। পুলিশকে বললে কোন ফল হবে না।’

‘কে ওরা?’

‘কথা বাড়িও না। কাজে যাও। ঝামেলা করলে আমাদের জানটাও যাবে।’

রিসেপশনিস্টের কথা শেষ না হতেই ব্রাস ফায়ারের শব্দে গোটা রেস্ট হাউসটাই যেন কেঁপে উঠল।

রিসেপশনিস্ট তার ফ্যাকাসে মুখ এবং চোখ ভরা আতংক নিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

ব্রাস ফায়ারের আবারও শব্দ হলো এবং তার পরেই লিফটের দরজা খুলে গেল। নেমে এল পিয়েরে পল।

তার পেছনে কয়েকজন স্টেনগানধারী ওমর বায়াকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এল লিফট থেকে।

তারা দ্রুত রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল।

রিসেপশন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পিয়েরে পল রিসেপশনিস্টকে লক্ষ্য করে বলল, ‘রিসেপশনিস্ট, কষ্ট করে তোমরা ‘লিটল’-এর লাশটা সরিয়ে ফেলো। পুলিশকে বলতে পার যে, ‘ব্ল্যাক ক্রস একজন বিশ্বাসঘাতককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।’

পিয়েরে পল ওমর বায়াকে নিয়ে তার গাড়িতে উঠল। বলল, ‘তোমরা সবাই এ গাড়িতে ওঠ। শুধু একজন আমাদের ঐ গাড়িটা ড্রাইভ করে পেছনে পেছনে এস।’

পিয়েরে পলের গাড়ি চলতে শুরু করল।

স্টেনগানের শব্দ থেমে যেতেই লুই ডোমাস দরজা খুলল। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি কোন রুমে কি ঘটছে। ঘুম ভাঙার পর মনে হয়েছিল গোটা রেস্ট

হাউসই যেন বুলেটে ঝাঝরা হচ্ছে। কিন্তু পাশেই যখন কক্ষের দরজায় স্টেনগানের গুলী বৃষ্টি হলো, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। এরপর সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেছে যে, পরবর্তী আক্রমণ তার ঘরেই আসছে। কিন্তু আসেনি। স্টেনগানের গুলী থেমে যাবার পর সে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। বুদ্ধিমান লুই ডোমাস দেখল, ওমর বায়ার ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ঘরের দরজা খোলা। ঘর খালি। ছ্যাত করে উঠল লুই ডোমাসের মন। ব্ল্যাক ক্রস আবার ধরে নিয়ে গেল ওমর বায়াকে!

লুই ডোমাস 'লিটলে'র ঘরের সামনে এসে দেখল, লিটলের ঝাঝরা হয়ে যাওয়া দেহ মেঝেতে পড়ে আছে। তার ঘরের দরজাও বুলেটে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া।

হঠাৎ আহমদ মুসার কথা মনে হলো লুই ডোমাসের। তিনি এখানে থাকলে নিশ্চয় এই ঘটনা ঘটত না। কি বলবেন তিনি এসে দেখলে। বিশেষ করে লুই ডোমাসকে অক্ষত দেখে! সত্যি লুই ডোমাস কিছুই করতে পারেনি।

বিরাট একটা আবেগ লুই ডোমাসের বুক ফুঁড়ে আসতে চাইল। সেই আবেগে তার চোখ ফেটে এল অশ্রু।

এই সময় পাশের দু'টি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সৌম্য দর্শন একজন ভদ্রলোক এবং একজন তরুণী।

লুই ডোমাসকে ভাঙা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে? ঘটনা কি?'

ভদ্রলোকের প্রশ্নে লুই ডোমাসের আবেগ আরও যেন উথলে উঠল। সে কথা বলতে পারল না। চোখে অশ্রু বেড়ে গেল।

ভদ্রলোক একটু এগিয়ে এসে ঘর দু'টির দিকে নজর বুলিয়ে লুই ডোমাসকে হাত ধরে টেনে তার ঘরে প্রবেশ করল।

তরুণীটিও তার ঘরের দরজা টেনে এ ঘরে এসে ঢুকল।

তারা সন্ধ্যায় প্যারিস থেকে সেন্ট পোল ডে লিউন যাবার পথে এখানে এসে উঠেছে। গত চারদিন আহমদ মুসার কোন খবর ডোনা পায়নি। উদ্বিগ্ন ডোনা আহমদ মুসার সন্ধানে পিতাকে নিয়ে এসেছে।

ঘরে প্রবেশ করে মিশেল প্লাতিনি চেয়ারে বসল।

ডোনা গিয়ে তার আব্বার বিছানায় বসল।

মি. প্লাতিনি লুই ডোমাসকে অবশিষ্ট চেয়ারটিতে বসতে বলল।

কিন্তু লুই ডোমাস মিশেল প্লাতিনির সৌম্য দর্শন অভিজাত চেহারার দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসতে গেল না। দাঁড়িয়েই থাকল।

কি ঘটেছে বল?' বলল মিশেল প্লাতিনি।

'আপনি দেখলেন, একজনকে ওরা হত্যা করে গেছে।

আরেকজনকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'ওরা কারা?'

লুই ডোমাস মিশেল প্লাতিনির দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে শংকা। উত্তর দিল না প্রশ্নের।

'ভয় করো না, রেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে আমি টেলিফোন করেছি। ওরা এসে যাবে।' মিশেল প্লাতিনি অভয় দিয়ে বলল।

'ওরা ব্ল্যাক ক্রস।'

'ব্ল্যাক ক্রস?' মিশেল প্লাতিনি এবং ডোনা এক সাথেই উচ্চারণ করল। তাদের চোখ-মুখেও ফুটে উঠল শংকার ছাপ।

'ব্ল্যাক ক্রসের সাথে তোমাদের কি বিরোধ? তোমরা কারা?'

'অনেক কথা স্যার।'

'বল। পুলিশকেও তো জানাতে হবে!' বলল মিশেল প্লাতিনি।

'আমরা ঘণ্টা খানেক আগে এ রেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। আমরা পাঁচজন। তিন জন এখানে ছিলাম। দু'জন মেয়ে আছে পশ্চিম পাশের রেস্ট হাউসে এবং আরেকজন পূর্ব পাশের রেস্ট হাউসে।'

'ওদের খবর দিয়েছ?'

'না স্যার। মাথা আমার গুলিয়ে গেছে। আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি।'

'অবশ্যই।'

লুই ডোমাস টেলিফোন করল আহমদ মুসার রেস্ট হাউসে। রেস্ট হাউসের এক্সচেঞ্জ ধরলে ১১ নং কক্ষে দিতে বলল।

কিছুক্ষণ পর এক্সচেঞ্জ জানাল, 'টেলিফোন ধরছে না।'

লুই ডোমাস অনুরোধ করল, 'খুবই জরুরি, দয়া করে ডেকে দিন। এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'দুর্ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।'

অল্পক্ষণ পরেই ওপার থেকে জানাল, 'ঘরে কেউ নেই। গোলাগুলীর শব্দের পরপরই উনি বেরিয়ে গেছেন।'

টেলিফোন রেখে ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর লুই ডোমাস। উদ্বেগ ও হতাশায় ভেঙে পড়েছে সে।

'কি হলো, আরো কিছু দুঃসংবাদ?'

'সর্বনাশ হয়েছে স্যার, ঐ রেস্টুরেন্টে যিনি ছিলেন তিনিও নেই। গোলাগুলীর শব্দ পাবার পর পরই তিনি বেরিয়ে গেছেন।'

'এতে সর্বনাশের কি আছে? উনি আছেন। আসবেন। কোথাও হয়তো পালিয়ে আছেন।'

'না স্যার। দুনিয়ার সব লোক পালালেও উনি পালাতে পারেন না। আর যখন তিনি বেরিয়েছেন, তখন এখানে অবশ্যই আসতেন। তাঁর কিছু ঘটল কিনা আমার ভয় হচ্ছে।'

একটু থামল লুই ডোমাস। তারপর বলল, 'স্যার আমি উঠি। পাশের রেস্ট হাউসে আমাদের সাথী দু'টি মেয়ে আছে। ওদের কিছু হলো কিনা দেখি। ওদের একজন খুবই বিপদগ্রস্ত। দেখা মাত্র ব্ল্যাক ক্রসের লোকেরা ওকে সামনের ঘরের এই লোকের মতই হয় খুন করবে, না হয় ধরে নিয়ে যাবে।'

বলে উঠে দাঁড়াল লুই ডোমাস।

ডোনার মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। অনিশ্চিতের অন্ধকারে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। বার বার আহমদ মুসার মুখ তার হৃদয়ে এসে উঁকি দিচ্ছে। লুই ডোমাস উঠে দাঁড়ালে ডোনা দ্রুত বলল, 'আপনি যে বিপদগ্রস্ত মেয়েটির কথা বললেন তার নাম কি, রুম নাম্বার কত?'

‘নাম এলিসা গ্রেস। নাম্বার ৩৩৩। পশ্চিম পাশের রেস্ট হাউসটিই।’

লুই ডোমাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

লুই ডোমাস বেরিয়ে যেতেই ডোনা বলল, ‘আব্বা আমার মন খারাপ লাগছে খুব। আমি কোন প্রমাণ দিতে পারবো না। কিন্তু এসব ঘটনার মধ্যে আমি কেন জানি আহমদ মুসাকে দেখতে পাচ্ছি।’

‘তুমি এমনিতেই উদ্বিগ্ন। তাই এমন মনে হচ্ছে। ব্ল্যাক ক্রস কত ঘটনার সাথে জড়িত। সে ধরনেরই একটা কিছু এটা।’

‘ঐ অসহায় মেয়েটার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে আব্বা। মনে হচ্ছে ওমর বায়ার মতই সে ব্ল্যাক ক্রসের একজন অসহায় শিকার।’

‘তুমি তো জান, ব্ল্যাক ক্রসের কোন ব্যাপারে তুমি, আমরা জড়াই, আহমদ মুসা তা পছন্দ করে না।’

‘এটা ওর অতি সাবধানতা। কিন্তু নিজের বেলায় উনি মোটেই সাবধান নন।’

‘মা তবুও তার অনুপস্থিতিতে ঐ ধরনের কোন কিছুতে জড়ানো ঠিক হবে না।’

‘জড়াব না আব্বা, আমি শুধু কথা বলব ওর সাথে। দেখুন, যতই অসুবিধা হোক আহমদ মুসা অসহায়ের সাথে থাকেন, বিপদ-আপদের তোয়াক্কা না করেই ছুটে যান তার সাহায্যে।’

‘ও তো সাধারণ নয় মা। ও একাই একটা আন্দোলন। ঠিক আছে মা, সকাল হোক ওখানে যাওয়া যাবে।’

চিন্তা ও উদ্বেগ-পীড়িত মন নিয়ে ডোনা ফিরে গেল তার কক্ষে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ফজর নামাজের সময় হয়ে গেছে।

ডোনা ওজু করার জন্যে টয়লেটে চলে গেল।

সকালে নিচে নেমে মিশেল প্লাতিনি দেখল, রেস্ট হাউসের পার্কিং-এ তাদের গাড়ি ছিল, সে গাড়ি এখন নেই। বিস্মিত হয়ে সে ডোনার দিকে তাকাল। ডোনারও চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, ‘গাড়ি কে নিয়ে যাবে আব্বা? লক করাও ছিল।’

ডোনা ও ডোনার আব্বা সিকিউরিটি বক্সে গিয়ে জিজ্ঞেস করল গাড়ির কথা।

সিকিউরিটির লোক বলল, ‘ব্যাপারটা আমরা রেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আমাদের কিছু করার ছিল না স্যার।’

‘কি করার ছিল না? কি ঘটেছে?’ বলল মিশেল প্লাতিনি।

‘স্যার, যারা আমাদের রেস্ট হাউসে হামলা করেছিল, তারা চলে যাবার সময় পূর্ব পাশের রেস্ট হাউসের দিক থেকে একজন ছুটে আসে। সে আপনাদের গাড়িটি খুলতে চেষ্টা করে। খুলতে না পেরে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকে গাড়িটা নিয়ে যায়। তার হাতে রিভলবার ছিল। আমরা কিছুই করতে পারিনি ভয়ে।’

মিশেল প্লাতিনি ও ডোনা অবাক-বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল।

চলে এল তারা।

পশ্চিম পাশের রেস্ট হাউসের দিকে চলছিল ডোনা এবং তার আব্বা।

দু’জনের কারও মুখেই কোন কথা নেই।

এক সময় ডোনা বলল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছ আব্বা? এ ঘটনার অর্থ কি দাঁড়ায়?

‘কিছু কিছু বুঝতে পারছি। পূর্ব পাশের রেস্ট হাউসের যে লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বলে শুনেছিলাম আমরা, সেই সম্ভবত আমাদের গাড়ি নিয়ে গেছে।’

‘ঠিক বলেছ আব্বা। আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আব্বা একটা অঙ্ক মিলছে না।’

‘কি অঙ্ক?’

‘থাক আব্বা।চল তাড়াতাড়ি এলিসাদের ওখানে।’

তিন তলায় ৩০ নাম্বার কক্ষ এলিসা গ্রেসের। এ কক্ষের পাশেরটিই সম্ভবত দ্বিতীয় মেয়েটির।

ডোন নক করল ৩৩ নাম্বার কক্ষের দরজায়।

দরজার ডোর ভিউ রয়েছে।

নক করার প্রায় সংগে সংগেই দরজা খুলে গেল কক্ষের।

দরজা খুলে দিয়ে 'গুড মর্নিং' বলে পাশে সরে দাঁড়াল লুই ডোমাস।

'গুড মর্নিং' বলে ঘরে প্রবেশ করল ডোনা। তার আব্বা মি. প্লাতিনি ডোনার পরে প্রবেশ করল ঘরে।

এলিসা গ্রেস কাঁদছিল।

চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল সে। তার পাশেই বসে আছে পিয়েরা।

লুই ডোমাস দু'টি চেয়ার টেনে বসতে দিল মি. প্লাতিনি এবং ডোনাকে।

মি. প্লাতিনি বসল।

ডোনা বসার আগে এলিসা গ্রেসের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় এলিসা গ্রেস। আপনার কথা শুনেছি। কথা বলতে এলাম। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

বলে একটু থেমে ডোনা আবার বলা শুরু করল, 'উনি আমার আব্বা মিশেল প্লাতিনি লুই এবং আমি মারিয়া জোসেফাইন লুই।'

নাম শুনেই এলিসা গ্রেস, পিয়েরা পেরিন এবং লুই ডোমাসের চোখে-মুখে উৎসুক্য ফুটে উঠল। তাকাল তারা পরস্পরের দিকে।

বলল পিয়েরা, 'মাফ করবেন। নাম দু'টি আমাদের পরিচিত। আমাদের বুরবো রাজবংশের নামগুলোর মত। আমাদের এ ধারণা কি সত্য?'

'হ্যাঁ সত্য। এ প্রসংগ থাক। এখন বলুন, পূর্ব দিকের রেস্ট হাউস থেকে আপনাদের যে লোক বের হয়ে গিয়েছিল, তিনি ফিরেছেন কি?'

ডোনা যখন একথাগুলো বলছিল, তখন ওরা তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে বাউ করল প্লাতিনি এবং ডোনাকে।

বাউ করে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল। ডোনার প্রশ্নের জবাব দিল লুই ডোমাস। বলল, 'না, ফেরেননি।'

‘ওর নাম কি?’

ওরা সবাই একটু দ্বিধা করল। তারপর এলিসা গ্রেস বলল, ‘নাম আহমদ মুসা।’

‘যিনি কিডন্যাপ হয়েছেন তিনি কি ওমর বায়া?’ দ্রুত কাঁপা কণ্ঠে বলল ডোনা।

‘হ্যাঁ।’ বলল এলিসা গ্রেস। বলেই দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল এলিসা গ্রেস।

ওদিকে ডোনা দ্রুত উঠে তার আব্বার কোলে মুখ গুজল। অল্পক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, ‘শুনেই বুঝেছিলাম, আহমদ মুসা না হলে মানুষের জন্যে বিপদের পেছনে এমন করে কেউ ছুটতে পারে না আব্বা।’ ডোনার মুখ অশ্রু ধোয়া। বলতে গিয়ে তার কন্ঠ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ডোনার এই কান্না দেখে থেমে গিয়েছিল এলিসা গ্রেসের কান্না।

এলিসা গ্রেস, পিয়েরা ও লুই ডোমাস সকলের চোখেই অপার বিস্ময়।

তারা বুঝতে পারছে না, তাদের রাজকুমারী ওমর বায়ার নাম জানল কি করে, আহমদ মুসার কথা বলে কাঁদছেই বা কেন?

পরবর্তী বই

ক্রস এবং ক্রিসেন্ট

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Jafar Jewel
2. Kayser Ahmad Totonji
3. Neehon Forid
4. Nazmus Sakib
5. Mujtahid Akon
6. Abu Taher
7. Hafizul Islam
8. Md Amdadul Haque Swapan
9. Neehon Forid
10. Kayser Ahmad Totonji
11. Sohel Shazuli
12. Ashrafuj Jaman
13. Misbah Ahmad Chowdhury Fahim
14. Shaikh Noor-E-Alam